গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২ - ৮ জানুয়ারি, ২০০৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

পেট্রল ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে সরকার জালিয়াতি করছে

পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস-কেরোসিনের মূল্য নিয়ে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার জনসাধারণের সাথে যে জালিয়াতি করছে, বিশ্বে তার নজির আছে কিনা সন্দেহ। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ৭৭ শতাংশ কমলেও এ দেশে পেট্রোপণ্যের দাম কমানোর দাবি কংগ্রেস সরকার বারবার উপেক্ষা করে যাচ্ছে। গত এক বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ৫৫ শতাংশ বেড়েছে। ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারির পরের এক বছরে গমের দাম দ্বিগুণ হয়েছে, চালের দাম পৌঁছেছে দশ বছরের সর্বোচ্চ স্তরে, দুধ, মাংসের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ, ''ভারতের ৭৭ শতাংশের মতো মানুষের দৈনিক ২০ টাকা খরচ করার ক্ষমতা নেই'' (মে ২০০৮ এ, সেনগুপ্ত, কান্নন এবং রবীন্দ্রনের গবেষণাপত্র, সূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন ২৫-১২-০৮)। এই হল কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনের পরিণাম। এই অবস্থায় কর-দরবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি,বেকারত্ব প্রভৃতি সংকটে বিপর্যস্ত জনগণকে পেট্রোপণ্যের দাম কমিয়ে যতটা স্বস্তি দেওয়া যেত, বৃহৎ তেল-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কংগ্রেস তা দিল না। দেশজুড়ে পেট্রোপণ্যের দাম কমানোর দাবি ওঠায় অনেক টালবাহানার পর নিতান্ত বাধ্য হয়ে তারা পেট্রোল-ডিজেলের দাম নামমাত্র কমিয়েছে, কেরোসিন এবং রান্নার গ্যাসের দাম কমালই না। যে কেরোসিন তেল না হলে গরিব মানুষের ঘরে আলো জ্বলে না, কংগ্রেস সরকার তার দাম কমাল না। কিন্তু ধনী লোকেরা যে বিমানে চড়ে তার জ্বালানির দাম কমাল। এই সরকার তা হলে কাদের হয়ে কাজ করছে?

১৯ ডিসেম্বরের সংবাদ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাজারে এক ব্যারেল (১৫৯ লিটার) তেলের দাম এখন ৩৫ ডলার। ১১ জুলাই এই দাম ছিল

১৪৭.২৭ ডলার। অর্থাৎ ৭৭ শতাংশ দাম কমেছে। এই হিসাবে দাম কমলে এক সিলিন্ডার গ্যাসের দাম ৩৫০ টাকা থেকে কমে ১০০ টাকার নীচে নেমে যায়। একইভাবে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১২ টাকা এবং ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯ টাকার বেশি কোনও অবস্থাতেই হতে পারে না। অথচ সরকার পেট্রোলের দাম নিচ্ছে ৪৭.১৯ টাকা, আর ডিজেলে ৩৩.৯২ টাকা। মিলিয়ে দেখুন, বিশাল ফারাক।

গত জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা বাড়িয়েছিল। এক ধাপে এত বৃদ্ধি নজিরবিহীন। অপরিশোধিত তেল থেকেই রান্নার গ্যাস, কেরোসিন ইত্যাদি তৈরি হয়। সরকার বলছে গ্যাসে, কেরোসিনে ভরতুকি দিতে হয়, তাই দাম কমানো সম্ভব নয়। গ্যাস-কেরোসিনে সত্যিই ভরতুকি দিতে হয় কি না, দিলে কতখানি দিতে হয়, সে সম্পর্কে সরকার দেশের মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছে। তাছাড়া, ভরতুকির কথা বললে, সরকারকে আগে স্পষ্ট করে জানাতে হবে, পেট্রোপণ্য থেকে কত পরিমাণ ট্যাক্স সরকার আদায় করে, এবং এই

সাতের পাতায় দেখুন

অ্যাড হক পাঁচশ টাকা আদায় করল চটকল শ্রমিকরা, বাকি দাবি আদায়ে লড়াই জারি থাকবে

দেশি-বিদেশি পুঁজিমালিকদের স্বার্থবাহী পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার, চটকল মালিক এবং তাদের ধামাধরা শ্রমিক ইউনিয়ন সিটু'র সম্মিলিত বিরোধিতা ও রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এ রাজ্যের আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক ১ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক গৌরবোজ্জ্বল ও ঐতিহাসিক লাগাতার ধর্মঘট সফল করল। চটকল শ্রমিকদের এই সাহসিক সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়েছে এস ইউ সি আই এবং শ্রমিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি। এই বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘটের চাপেই গত ১৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করতে। এর ফলে মালিকপক্ষের অনিচ্ছুক হাত থেকে শ্রমিকরা মাসিক পাঁচশ টাকা 'অ্যাড হক' আদায় করতে পেরেছে এবং ঠিক হয়েছে, একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি আগামী ৮ সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য দাবিগুলি সম্পর্কে তাদের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রকের কাছে পেশ করবে।

বস্তুত, নতুন কোনও দাবি আদায়ের জন্য নয়, দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা যে অধিকারগুলি অর্জন করেছে, সরকারি আইনবলে ইতিমধ্যেই যেগুলি স্বীকৃত, চটকলগুলিতে সেই সমস্ত আইন রূপায়ণের দাবিতেই এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল শ্রমিকরা।

সিপিএম সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে বছরের পর বছর ধরে মালিকরা চটকলগুলিতে জঙ্গলের রাজত্ব চালিয়ে আসছে। গত ২২ মাস ধরে মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা বর্ধিত ডি এ, যার পরিমাণ মাথাপিছু ১ হাজার টাকা, তার এক পয়সাও দেয়নি। হাজার হাজার অবসরপ্রাপ্ত জুটশ্রমিকের প্রাপ্য গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং ই এস আই-এর বিপুল পরিমাণ টাকা মালিকরা আত্মসাৎ করেছে। আগের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী চটকল শ্রমিকদের ৯০ শতাংশেরই স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করার কথা। অথচ চটকলে স্থায়ী শ্রমিক রয়েছে মাত্র ৩৫ শতাংশ। বাকিদের অধিকাংশ কাজ করেও নামহীন শ্রমিক যারা 'বিনা নামওয়ালা', 'ভাউচারওয়ালা', 'জিরো নাম্বারওয়ালা' হিসাবে চটকলে পরিচিত। এরা প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই কিংবা কারখানা আইন অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পায় না শুধু নয়, সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির পরিবর্তে কেউ ৭০ টাকা, কেউ ৬০ টাকা, কেউ বা মাত্র ৪০ টাকা দৈনিক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। পরিবার-পরিজনের জন্য দু'মুঠো ভাত জোগাড়ের প্রয়োজনে এই নামমাত্র মজুরিতেও চটকলে শ্রমিকের অভাব হয় না। মালিকী শোষণের জাঁতাকলে পড়ে মুখে রক্ত তুলে খেটে মরে শ্রমিক, মুনাফা লোটে মালিকরা।

শ্রমিকদরদের গালভরা বুলি আওড়াতে আওড়াতেই মালিকের এই নির্মম শোষণে মদত দিয়ে চলেছে এ রাজ্যের সিপিএম সরকার। ১৯৬২ সালে গঠিত হয়েছিল জুট ওয়েজ বোর্ড। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য শ্রমিকদের দৈনিক কত ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন এবং সেই শক্তি জোগাতে কী পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, তা হিসেব করে মজুরির হার নির্ধারণ করে দিয়েছিল এই বোর্ড। ৩২ বছরের সুদীর্ঘ শাসনকালে সিপিএম সরকার সেই হারে মজুরি চালু করতে পারল না! এই তার শ্রমিকদরদের নমুনা। চটশ্রমিকের দুরবস্থা ঘোচানোর সামান্যতম সদিচ্ছাও যে এই সরকারের নেই, তা আরও একটি ঘটনায় বোঝা যায়। ১৯৮০ সাল থেকে বছরের পর বছর ধরে সিপিএম সরকার

তিনের পাতায় দেখুন

● ডিজেল-পেট্রোলের দাম কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রাজ্য সরকার কর্তৃক চাপ সৃষ্টি করা ● ডিজেল ও পেট্রোলের দাম যথাক্রমে লিটার প্রতি ৯ টাকা ও ১৩ টাকা করা, পেট্রোপণ্যের দাম কমায় রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ১০০ টাকা এবং কেরোসিন তেলের দাম লিটার প্রতি ২.৫০ টাকা করা, ● দাম কমার অনুপাতে কলকাতায় বাসভাড়া প্রথম স্টেজে ২ টাকা এবং পরবর্তী স্টেজ পিছু ৫০ পয়সা, দূরপাল্লার বাসে কিমি প্রতি ৩০ পয়সা এবং মফঃস্বল জেলায় ভাড়া কমানো, ফেরি ভাড়া ৪ টাকার পরিবর্তে ১ টাকা করা, ● নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো এবং খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা, ● ১০০ দিনের কাজের স্কিম পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা, গ্রামীণ সমস্ত কর্মক্ষম মানুষকে জবকার্ড দেওয়া, কাজ অথবা মজুরি সমহারে ভাতা দেওয়া, ● সমস্ত গরিব মানুষের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, ● গার্হস্থ্য-ক্ষুদ্রশিল্প-ছোট ব্যবসায় বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ১ টাকা এবং কৃষিতে ৫০ পয়সা করা, ● অবিলম্বে নতুন রেশন কার্ড ইস্যু করে পুরনো সমস্ত রেশনকার্ড বাতিল করা এবং ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস রেশন মারফত সরবরাহ করা, ● সরকারি ৩ লক্ষ শূন্য পদে ২০০৯ সালের মার্চের মধ্যে নিয়োগ করা, ● আলু চাষিদের ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা, সার,বীজ, বিদ্যুৎ ও কীটনাশকের দামে ভরতুকি ও বিনামূল্যে বন্ড সরবরাহ করা, সারের কালোবাজারি বন্ধ করা, ● শিক্ষাক্ষেত্রে ফি-বৃদ্ধি ও ডোনেশন প্রথা রদ, জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনতা ও ব্যাভিচার সৃষ্টির নীতি বাতিল করা, ● নারী নির্যাতন ও পাচার বন্ধ করা, ● পিটিটিআই সমস্যার সমাধান করা, ● গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর ফ্যাসিবাদী অত্যাচার বন্ধ করা, সাংবাদিকদের উপর ক্ষমতাসীন দলের দমনপীড়ন বন্ধ করা, ● সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফেরত দেওয়া, ● স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অ্যাক্ট বাতিল করা, ● রাজ্য সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্যে গঠিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস করপোরেশন লিমিটেড' বাতিল করা, ● কেন্দ্রীয় সরকারের 'সিডিউলড ট্রাইব অ্যান্ড আদার ট্র্যাডিশনাল ফরেস্ট ডুয়েলার্স (রেকগনিশন অফ ফরেস্ট রাইট) অ্যাক্ট, ২০০৬' অনুযায়ী জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার দেওয়ার দাবিতে

১৮ দফা দাবিতে
২২ জানুয়ারি
সারা বাংলা
সাধারণ ধর্মঘট
সফল করুন

জেলায় জেলায় বিদ্যুৎগ্রাহকদের আইনঅমান্য

বর্ধমান

সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে— এই দাবিতে বর্ধমান জেলায় গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের প্রোজেক্ট ম্যানেজার-এর কাছে ২৩ ডিসেম্বর কয়েকশত বিদ্যুৎগ্রাহক ডেপুটেশন দেন। এলাকার মানুষের গণস্বাক্ষর সহ এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকা বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য তপন মাঝি।

এরপর গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্পে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ, কৃষিতে ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ মাশুল কমানো অথবা ১০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া, ২০০৮-২০০৯ সালের বেআইনি বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করা প্রভৃতি দাবি নিয়ে সুসজ্জিত মিছিল করে বিদ্যুৎগ্রাহকরা বর্ধমান ডি এম অফিসে আইনঅমান্য করে। ডি এম অফিসেই ম্যাজিস্ট্রেট তাদের গ্রেপ্তার করেন এবং গাড়ির ব্যবস্থা না থাকায় সকলের মুক্তি ঘোষণা করেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস।

বীরভূম

একই দাবিতে ১৫ ডিসেম্বর অ্যাবেকার ডাকে বীরভূম জেলাশাসক ও সার্কেল ম্যানেজারের অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। ১৫টি গ্রুপ সাপ্লাই থেকে, চাষের অতি ব্যস্ততম এই সময়েও পাঁচ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক এই বিক্ষোভে অংশ নেন। রাজ্য নেতা প্রদ্যোৎ চৌধুরী এবং জেলা কমিটির পক্ষে মদন ঘটক, নুরুল ইসলাম, আবুল কালাম, আব্দুল হালিম, অসিত মজুমদার, বিশ্বনাথ মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় বিক্ষোভ মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছালে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। সার্কেল ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সাথে নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ আলোচনা করেন। কর্তৃপক্ষ সংশোধিত বিল পাঠানো, দ্রুত ট্রান্সফরমার ও বিদ্যুৎ সংযোগের এবং লাইন না কাটার প্রতিশ্রুতি দেন। আন্দোলনের সাফল্যে উপস্থিত মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

হুগলি

১১ ডিসেম্বর অ্যাবেকা হুগলি জেলা কমিটির ডাকে সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক আইন অমান্য করেন। চুঁচুড়ার খাদিনা মোড়ে জমায়েত হয়ে মিছিল করে তাঁরা প্রোজেক্ট ম্যানেজারের নিকট স্মারকলিপি দেন। এরপর মিছিল চুঁচুড়া কোর্টের রেজিস্ট্রি অফিসের দিকে এগোলে চুঁচুড়া থানার আই সি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। এরপর আন্দোলনকারীরা পুলিশের কর্ডন ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। জেলা সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী এবং সহসম্পাদক মণিমোহন ঘোষের নেতৃত্বে আইনঅমান্য শুরু হয়। উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট ১ হাজার আইন অমান্যকারীকে গ্রেপ্তার করার ঘোষণা করেন। উপস্থিত আইন অমান্যকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে জেলা সম্পাদক প্রশাসনকে সতর্ক করে বলেন, চাষ শুরু হতে যাচ্ছে, এখন কোনও অবস্থাতেই চাষিদের লাইন কাটা চলবে না। যদি কাটা হয়, তবে তা প্রতিরোধ করা হবে। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হলে প্রশাসনকেই তার দায় নিতে হবে।

উল্লেখযোগ্য গত ২১ মাস ধরে কৃষি বিদ্যুতে মিটার-কারচুপির প্রতিবাদে রাজ্যের অনেক জেলাতেই বিল বয়কট চলছে। বিক্ষোভ চলছে হুগলি জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ গ্রুপ সাপ্লাইয়ে। প্রতিদিনই সেগুলিতে সামিল হচ্ছেন শত শত বিদ্যুৎগ্রাহক।

দিনহাটা কলেজে এস এফ আইয়ের বর্বর হামলা

গত বছর কোচবিহারের দিনহাটা কলেজে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির কাছে পরাজিত হয়েছিল এস এফ আই। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে এবারও হারবে— এই আশঙ্কা থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার জন্য তারা হামলাবাজির আশ্রয় নেয়। ১৮ ডিসেম্বর ছিল নমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার দিন। সেদিন ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা নমিনেশন জমা দিতে গেলে এস এফ আই তাদের উপর ব্যাপক হামলা চালায়। ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা রুখে দাঁড়ালে তারা সাময়িকভাবে পিছু হটে এবং পরে আরও সমাজবিরোধীদের জড়ো করে দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ করে। দ্রুত ডি এস পি (ক্রাইম) এবং এস ডি ও বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন। তাঁরা এসে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির উপর আক্রমণ চালাতেই এস এফ আইকে সাহায্য করেন। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কলেজে এবং কলেজের বাইরে দফায় দফায় আক্রমণ চলে।

এই আক্রমণে ২৫ জন ছাত্র আহত হয়, তার মধ্যে ১৪ জনের আঘাত গুরুতর। জাহানুর হক এবং মিঠুন রায়কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। লোহার রডের আঘাতে জাহানুরের মাথায় রক্ত জমাট বেঁধেছে। মিঠুনের হাত ভেঙেছে। চোয়াল ভেঙে গিয়েছে দীপ্তি রায়ের। তাকে এম জে এন হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। সারদামণি রায়ের মাথায়১০টি সেলাই পড়েছে। লিপিকা রায়ের মাথায় ৬টি সেলাই পড়েছে, তাঁর কাঁধের হাড়ে চিড় ধরেছে। দুলাল রহমানের মাথা ফেটেছে। পাঞ্চালি রায়ের মাথার আঘাতও গুরুতর। ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নেতা আজিজুল হকের আঙুল ভেঙে দিয়েছে। এরা সকলেই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ছাত্রছাত্রীদের উপর এই আক্রমণের প্রতিবাদে অভিভাবকরা এবং শহরের নাগরিকরাও রাস্তায় নামেন। পরদিন ১৯ ডিসেম্বর পাঁচ শতাধিক নাগরিক থানা ঘেরাও করে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। ২৪ ডিসেম্বর তাঁরা এস ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখান।

এদিকে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে এই নির্বাচনের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কোর্টে আপীল করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর দিনহাটা কোর্ট স্থগিতাদেশ দেয়। খবরে প্রকাশ কলেজের প্রিন্সিপাল এবং গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান কোর্টের নোটিশ গ্রহণ না করে অবৈধভাবে সংসদের কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এস এফ আই যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন হারাচ্ছে এই আক্রমণ তারই প্রমাণ।

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের শ্রীরামপুর আঞ্চলিক সম্মেলন

ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর মাহেশ বঙ্গ বিদ্যালয়ে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের শ্রীরামপুর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষিকা ফুল্লরা সেনগুপ্ত।

মূল প্রস্তাব ও সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন যথাক্রমে কমরেডস্ নীলিমা মোদক ও সীমা বর্ধন। ৭ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্যা কমরেড অনিতা সেনগুপ্ত। ফুল্লরা সেনগুপ্তকে উপদেষ্টা, কমরেড নীলিমা মোদককে সভানেত্রী এবং কমরেড অপর্ণা ভট্টাচার্যকে সম্পাদিকা করে শ্রীরামপুর আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

নিস্তারিণী কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রহসন

বন্ধে এ আই ডি এস ও-র তীব্র আন্দোলন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলার একমাত্র মহিলা কলেজ নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কর্তৃপক্ষ প্রতি বছরই এস এফ আই-এর স্বার্থে অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রহসনে পরিণত করে থাকে। কারণ শাসকদল মদতপুষ্ট কর্তৃপক্ষ জানে নির্বাচন হলেই ছাত্রীদের ভোটে এস এফ আই ঐ কলেজে চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত হবে, ডি এস ও-র জয় আটকানো যাবে না।

প্রতি বছর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তোলার নোটিস জারি থেকেই কর্তৃপক্ষ নগ্নভাবে নেমে পড়ে, যাতে ডি এস ও প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র তুলতেই না পারে। এবার যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য ডি এস ও-র পক্ষ থেকে ২ ও ৫ ডিসেম্বর কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বছরের পর বছর শহরের মধ্যে একটি কলেজে এ ধরনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ চলছে, সে কথা চিঠি দিয়ে জেলার বিশিষ্ট শিক্ষক-অধ্যাপক-আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের জানানো হয়।

১০ ডিসেম্বর ছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার দাবি জানায়। কিন্তু ঐ দিনই কলেজ শেষে দেখা যায়, কর্তৃপক্ষ ৮ ডিসেম্বরের পুরনো তারিখ দিয়ে একটি নোটিস ঝুলিয়ে জানিয়েছে, ১২ ডিসেম্বর বেলা ১টা থেকে মনোনয়নপত্র দেওয়া হবে। ঐ দিন ভোর থেকেই যথারীতি শুরু হয়ে যায় কর্তৃপক্ষের নির্লজ্জ কার্যকলাপ। নির্ধারিত সময় বেলা ১টা হলেও ভোর চারটে থেকেই কলেজ হোস্টেলের সুপার ছাত্রীদের ঘরে ঘরে গিয়ে জোর করে তাদের ঘুম থেকে তুলে মনোনয়নপত্র তোলার লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করেন, যাতে লাইন জ্যাম করে দিয়ে ডি এস ও প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তোলা বন্ধ করা যায়। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত লাইন জ্যাম থাকার ফলে স্বভাবতই ডি এস ও-র ছাত্রীরা মনোনয়নপত্র তুলতে পারেনি। ডি এস ও কর্মীরা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেও শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র না পাওয়ায় অধ্যক্ষকে ডেপুটেশন দেয়। অধ্যক্ষ কোনওরকম আশ্বাস না দিয়েই পুলিশের সহায়তায় কলেজ ছেড়ে চলে যান। ছাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে, প্রতিবাদে ১ ঘণ্টা পথ অবরোধ করে। এতেও কর্তৃপক্ষ সাড়া না দেওয়ায় ছাত্রীরা দলবদ্ধভাবে ডিএম অফিসে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখায়। ডি এম-এর পক্ষে এস ডি ও ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে ছাত্রীরা অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেয়। জেলাশাসক বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের চূড়ান্ত স্বৈরাচারী অবস্থানে অনড় থাকে। এই অবস্থায় ১৫ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র তুলতে ইচ্ছুক ছাত্রীরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সহ গভর্নিং বডির সমস্ত সদস্যদের বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখলে এস ডি ও কলেজে আসতে বাধ্য হন। তাঁর উপস্থিতিতে ডি এস ও-র প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এ সময় অবরোধস্থলে ডি ওয়াই এফ আই-এর কতিপয় নেতা চেন, রড ইত্যাদি নিয়ে হাজির হয়। উপস্থিত পুলিশকে তারা হুমকি দিয়ে বলে, 'পুলিশ যদি অবরোধ তুলতে না পারে, আমাদের বলুক, আমরাই অপারেশন করে দিচ্ছি'।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের চুক্তিতে পরের দিন জরুরি মিটিং ডাকার কথা লেখা হলেও মিটিংয়ের সময়ই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিরঞ্জন পুরোহিত 'এস ডি ও ডেকেছেন' — ছাত্রীদের কাছে এই মিথ্যা কথা বলে চলে যান। বাধ্য হয়েই আন্দোলন চালাতে চালাতেই ছাত্রীরা আইনগত লড়াইয়ের পথেও যায়। জেলা কোর্ট ২০ ডিসেম্বর ছাত্রীদের পক্ষে রায় দিয়ে এই নির্বাচনকে অগণতান্ত্রিক ও অবৈধ ঘোষণা করে স্থগিতাদেশ জারি করে।

আন্দোলনের এই জয়ে ছাত্রীরা উৎসাহিত। সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতামতের ভিত্তিতে আন্দোলনকে আরও সুসংহত ও বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ২৭ ডিসেম্বর পুরুলিয়া শহরে একটি গণকনভেনশন আয়োজিত হয়।

সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে

বীরভূমে দাবি আদায়

আলু এবং রবিশস্য চাষের মরশুমে রাসায়নিক সারের আকাল চলছে সর্বত্র। গত বছর আলুচাষিরা অগ্নিমূল্যে সার, বীজ কিনে চাষের পর আলুর ন্যায্য দাম না পেয়ে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ঋণভারে কয়েকজন চাষি আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। ন্যূনতম সরকারি সাহায্য তাদের জোটেনি। এবছরও চাষের শুরুতেই ব্যবসায়ীরা শুরু করেছে ব্যাপক কালোবাজারি। প্রশাসন উদাসীন। এর প্রতিবাদে জেলায় জেলায় চলছে কৃষক আন্দোলন।

আলুচাষি সংগ্রাম কমিটি এবং বীরভূম জেলা কৃষক সংগ্রাম কমিটির ডাকে ২৫ নভেম্বর সাঁইথিয়ার ভবানীপুর মোড়ে রাস্তা অবরোধ হয়। পলাশ মণ্ডল, প্রসেনজিৎ মণ্ডল, অজিত মণ্ডলদের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের দাবি মতো সার সরবরাহ করা এবং কয়েকটি গোডাউন রেড করায় আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৃষক সংগ্রাম কমিটির নেতা কুদ্দুস আলি।

পৌরকর প্রত্যাহারের দাবিতে পাঁশকুড়ায় বিক্ষোভ

ফুল, সবজি, বাদাম উৎপাদনে খ্যাত কৃষিভিত্তিক পাঁশকুড়া পৌরসভা এলাকায় নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানের কোনও উন্নতি হয়নি। অথচ পৌরকর্তৃপক্ষ অস্বাভাবিক হারে পৌরকর ধার্য করছে। বর্ধিত পৌরকরের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সাথে সাথে নাগরিকদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। পাঁশকুড়া পৌর নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে দলমত নির্বিশেষে মানুষ ১৫ ডিসেম্বর পৌরসভা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে পৌরকর প্রত্যাহার ও পৌর এলাকায় রাস্তা, জল নিকাশি, পানীয় জল ও আলো এবং নাগরিক স্বার্থে পৌরআইন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। পৌর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তেমন কোনও প্রতিশ্রুতি না মেলায় নাগরিকরা আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতির শপথ নেন। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন প্রণয় কুমার দাস, সুশীল জানা, সুব্রত মাইতি, আব্দুল মাসুদ, জ্যোতিষ নন্দ, গণেশ পাণিগ্রাহী, গৌরহরি খাঁড়া সহ আরও অনেকে।

চটশ্রমিকদের সংগ্রাম

একের পাতার পর

সাধারণ শ্রমিকদের ঘরভাড়া ভাতা হিসাবে মজুরির ৫ শতাংশ টাকা দিয়ে চলেছে। ইচ্ছা থাকলেই এই ভাতা আরও কিছুটা বাড়াতে সরকারের কোনও অসুবিধা ছিল না। এর জন্য মিলমালিকদের অনুমতিরও প্রয়োজন ছিল না, শুধু প্রয়োজন ছিল চটশ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থার প্রতি সামান্য সহানুভূতির। সিপিএম নেতৃত্বের মধ্যে আজ সেটুকুও অবশিষ্ট নেই।

শ্রমিকদের প্রতি তাদের এই আচরণই বুঝিয়ে দেয় , বাস্তবে তারা মালিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া কিছু নয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য, যেকোনও উপায়ে মালিকদের খুশি করে নিজেদের গদি সুরক্ষিত রাখা। এই কারণেই চটকল শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কর্মসূচি থেকে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু প্রথমে সহমত হয়েও পরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, চটকলে পুলিশ-প্রশাসন ও সিপিএমের সহায়তায় সিটুর আঞ্চলিক নেতৃত্ব ধর্মঘট ভাঙতে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে মারমুখী ভূমিকা পর্যন্ত নিয়েছেন। চটকল মালিকদের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী চূড়ান্ত শোষণমূলক বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করাই যখন প্রধান প্রয়োজন, সেই সময় ধর্মঘট থেকে সরে গিয়ে সিটু নেতৃত্ব মালিকদের পক্ষে দাঁড়ালেন ও শ্রমিকদের ঐক্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সিটুর বেইমানিতে শ্রমিকরা ভেঙে পড়েনি, তারা লড়াই করেছে। সিটুর এই ভূমিকা মালিকশ্রেণীও খুব ভালোভাবেই জানে। তাই চটকল ধর্মঘটে সিটু সামিল না থাকলেও ১৮ ডিসেম্বর নয়াদিল্লির বৈঠকে মালিকরা সিটুর আব্দার মেটাতে দাবি করে, সিটু চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে তবেই তারা সই করবে। সেই অনুযায়ী সিটু নেতৃত্বকে চুক্তি স্বাক্ষর করতে দেওয়া হয়, তারপর মালিকরা সই করে।

ফলে সিটু আজ মালিকশ্রেণীর একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত সংগঠনে পরিণত হয়েছে, এ কথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। যদিও সিটুর সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা আজও এতখানি অধঃপতিত হননি, তাঁরা আজও লড়াকু মানসিকতা নিয়ে চলছেন। তাই সিটুর নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই মনেপ্রাণে এই ধর্মঘট সমর্থন করেছেন, আন্দোলনরত শ্রমিকদের পাশে থেকে তাদের নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, ধর্মঘট সফল করার আহ্বান নিয়ে প্রচারাভিযান চালিয়েছেন, ছুটি নিয়ে দেশে চলে গিয়ে পরোক্ষে ধর্মঘট সফল করেছেন, এমনকী কোথাও কোথাও নেতৃত্বের নির্দেশে অমান্য করে সরাসরি ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি, সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সারা বিশ্ব জুড়েই আজ চূড়ান্ত সংকটে জর্জরিত। গোটা দুনিয়া জুড়ে চলছে ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাই। কাজ চলে যাওয়া এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীরা কিন্তু কোনও বিক্ষোভ, আন্দোলন বা ধর্মঘটে সামিল হওয়ার কারণে চাকরি খোয়ায়নি। বরং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মালিকের চাপানো সমস্ত শর্তের সঙ্গে আপস করে প্রাণপণে চাকরি বাঁচাবার চেষ্টাই করে গেছে। তবু চাকরি বাঁচানো যায়নি। আসলে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের মতো করে বাঁচার অধিকার আদায় করতে হলে, আপস করে নয়, লড়াই-আন্দোলনের পথই বেছে নিতে হয় শ্রমিকদের।

চটকল শ্রমিকরা আজ সেই সংগ্রামের পথই বেছে নিয়েছে। আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে চটশ্রমিকদের। পরাধীন ভারতের প্রায় ছয় লক্ষ চটকলশ্রমিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, স্বাধীনতার পরেও তারা একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলেছে, দাবি আদায় করেছে। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজও তারা মালিকের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে; সরকার, মালিকপক্ষ ও মালিকের পেটোয়া শ্রমিক সংগঠন সিটুর হুমকি ও সন্ত্রাসের পরোয়া না করে লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে গেছে। শুধু ধর্মঘট চলাকালেই যে চটকল শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ হয়েছে তাই নয়, ধর্মঘট তুলে নেওয়ার পরেও তাদের নানা অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র সদস্য হুগলির গ্যাব্রেস জুটমিলের ৫০০ মহিলা শ্রমিকসহ ১ হাজার শ্রমিককে ধর্মঘট করার অপরাধে মালিক কাজ দিচ্ছে না এবং পুলিশ ও গুণ্ডাদের কাজে লাগিয়ে এলাকায় প্রবল সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে।

শ্রমিকদের ওপর এই ধরনের জুলুম নতুন ঘটনা নয়, মালিকস্বার্থ রক্ষাকারী দেশে এ জুলুম চলবেই। এগুলিকে উপেক্ষা করে আপসহীন লড়াই চালাবার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি। তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য বলেছেন, নয়াদিল্লির এই চুক্তিটি অন্তর্বর্তীকালীন 'অ্যাড হক' চুক্তি। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের মনে রাখতে হবে, আমাদের ধর্মঘট সাময়িক তুলে নেওয়া হয়েছে মাত্র। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত সমস্ত দাবিগুলি এখনও পূরণ হয়নি। ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে সরকার ও মালিকপক্ষের ওপর জোরদার চাপ সৃষ্টি করতে না পারলে অতীতের বহু কমিটির সুপারিশের মতো এই ত্রিপক্ষীয় কমিটির সুপারিশও দিনের আলো দেখবে না। লড়াই করেই তা আদায় করতে হবে। প্রতিটি শ্রমিককে এ কথাও বুঝে নিতে হবে যে, যদি ত্রিপক্ষীয় কমিটির সুপারিশ শ্রমিকস্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে যেমন ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকদের লড়তে হবে, তেমনই যদি তা শ্রমিকদের পক্ষে যায়, তাহলেও লড়াই করেই শ্রমিকদের তা কার্যকর করতে হবে। তিনি বলেছেন, দাবি আদায়ের লড়াইয়ে কখনও আংশিক জয় হয়, আবার কখনও সম্পূর্ণ পরাজয় হয়। কিন্তু তার জন্য লড়াই কখনও ব্যর্থ হয় না। লড়াই-ই শ্রমিককে মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচতে শেখায়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের বীর জনসাধারণের অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিটি চটকলে এবং এলাকায় এলাকায় আন্দোলনের হাতিয়ার শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা পিছিয়ে গেলে এই সংগ্রাম কমিটিগুলিই লড়াই চালিয়ে যাবে, নেতাদের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত অন্ধের মতো অনুসরণ না করে বিচার-বিবেচনা করে তা গ্রহণ করবে, নেতারা বেইমানি করলে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেব। সিটু ইউনিয়নের শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা সঠিক নেতৃত্ব চিনে নিন, আপসকামী নেতাদের ত্যাগ করে সংগ্রামী নেতৃত্বের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন।

ছাঁটাই চটকল শ্রমিকদের জন্য গণকিচেন

২৯ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, হুগলির বাঁশবেড়িয়া জুটমিলের মালিক ধর্মঘট করার অপরাধে ৫০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। অভুক্ত এই শ্রমিকদের প্রতিদিন অন্তত একবেলা কিছু রান্না করা খাবার দেওয়ার জন্য ঐ এলাকায় গণকিচেন চালাবার পরিকল্পনা নিয়েছে এস ইউ সি আই। এজন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ হাজার টাকা প্রয়োজন। রাজ্যের জনগণকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আবেদন করেছেন।

এস ইউ সি আই অফিস বা ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে সাহায্য পাঠান।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বেইরুট সম্মেলন

১৬-১৮ জানুয়ারি ২০০৯, বেইরুট, লেবানন

বক্তা ঃ র‍্যামসে ক্লার্ক (আমেরিকা), প্রচণ্ড (নেপাল), থাম্বাইয়া (শ্রীলঙ্কা), অধ্যাপক ঘান্দুর (সুদান), কারালুস (ভেনেজুয়েলা), খালেকুজ্জামান (বাংলাদেশ), মহম্মদ হাবাশ (সিরিয়া), মানিক মুখার্জী (ভারত), জে গ্যাব্রিয়েলা (ইটালি), আলেকস মুম্বারিস (ফ্রান্স) ও অন্যান্য।

ইন্টারন্যাশানাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যান্ড পিপলস্ সলিডারিটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি

পিটিটিআই ছাত্ররা আমরণ অনশনে

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন এন সি টি ই-র প্রয়োজনীয় অনুমোদনহীনতা সংক্রান্ত পিটিটি মামলাটি দীর্ঘ ৩ বছর কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন অবস্থায় ছিল। গত ১ অক্টোবর '০৮ কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের ১৩৮টি পিটিটিআই থেকে প্রাপ্ত পিটিটি শংসাপত্রকে অবৈধ হিসাবে বিবেচনার রায় দেয়। কলকাতা হাইকোর্টের রায়দানের ৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পিটিটি সমস্যা সমাধানের কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি। এমতাবস্থায় ২ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সমিতির পতাকাতলে প্রায় ১ হাজার পিটিটি ভুক্তভোগী আমরণ অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গত ২৬ ডিসেম্বর রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে সংগঠনের কাছ থেকে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রস্তাব চেয়ে পাঠালেও তিনি পরবর্তীকালে 'রাজ্যের কিছুই করার নেই' বলে জানিয়ে দেন। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া অর্থহীন বলে জানিয়ে পিটিটি সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য সংগঠনের সম্পাদক প্রবীর ঘোষ নিম্নলিখিত দাবিগুলি তুলে ধরেছেন — ১) কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় অর্ডিন্যান্স জারি করার ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে, ২) কেন্দ্রীয় সরকারকে এককালীন ছাড় দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ৩) বৈধতা সংক্রান্ত সমস্যা মেটার পূর্বে সমস্ত পিটিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণরত ছাত্রছাত্রীকে আনট্রেন্ড হিসাবে অবিলম্বে 'স্পেশাল ক্যাটাগরি'তে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডায়মন্ডহারবারে অটোচালকদের বিক্ষোভ

পরিবেশ দূষণের নাম করে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত অটোরিক্সা বাতিল করার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৬ ডিসেম্বর ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেয় 'ডায়মন্ডহারবার অটো অপারেটার্স সমন্বয় কমিটি'।

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত এই সমন্বয় কমিটির প্রায় দু'শতাধিক অটোশ্রমিক অটো স্ট্যান্ড থেকে মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভার পর কমিটির সম্পাদক মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল এস ডি ও'র নিকট ছ'দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে।

শেষে অটোশ্রমিকরা মিছিল সহকারে ডায়মন্ডহারবার স্টেট বাসস্ট্যাণ্ডে প্রতিবাদ সভায় সামিল হন। সভায় এ আই ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শান্তি ঘোষ প্রধান অতিথির ভাষণে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত অটোরিক্সা বাতিল করার সরকারি ষড়যন্ত্রের নানা দিক তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন গড়িয়া অটো বাঁচাও কমিটির অন্যতম সংগঠক সত্যজিৎ চক্রবর্তী, এস ইউ সি আই ডায়মন্ডহারবার লোকাল কমিটির সম্পাদক গৌতম মণ্ডল, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য উমাপদ পুরকাইত, সমন্বয় কমিটির সম্পাদক মণিরুল ইসলাম, কানাই সরকার ও ইলিয়াস লস্কর। সভা পরিচালনা করেন সমন্বয় কমিটির সভাপতি সামসুল ইসলাম।

বৃত্তি পরীক্ষার কৃতীদের সম্বর্ধনা

নামখানা ব্লক বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটি ও নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির যৌথ উদ্যোগে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী, দুঃস্থ ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বদেশ চন্দ্র বেরা, বিভূরঞ্জন ঘোড়ই, দেবেন্দ্রনাথ প্রধান, ভাগবত রক্ষিত, মহাদেব মাঝি প্রমুখ। অন্যতম বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চাণক্য আচার্য।

নাগরিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের লক্ষ্যে ঢাকুরিয়া নাগরিক উন্নয়ন সমিতি গঠিত

গার্ডেনরীচের পরিস্রুত পানীয় জল প্রতি বাড়িতে সরবরাহ, রেলব্রিজের অসমাপ্ত কাজ শেষ করা, খোলা ড্রেন আন্ডারগ্রাউন্ড করা ইত্যাদি দাবি আদায়ের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে এলাকার নাগরিকদের উদ্যোগে ২১ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ জনকল্যাণ পরিষদে গঠিত হল 'ঢাকুরিয়া নাগরিক উন্নয়ন সমিতি'। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অরুণ ঘোষ ও শুভাশীষ দাস। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেবেশ চ্যাটার্জী, যিনি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ঢাকুরিয়া থেকে তিলজলা পর্যন্ত পাইপলাইন চালু করার কাজে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন শরদিন্দু ব্যানার্জী, অর্চনা মিত্র প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ডিপিএলের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার দীপেন্দ্রনাথ মুখার্জী।

রোজেনবার্গ দম্পতি হত্যা

সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া অপপ্রচার

সম্প্রতি কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হল যে, আমেরিকায় ১৯৫৩ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জুলিয়াস রোজেনবার্গ সত্যিই সোভিয়েট ইউনিয়নের গুপ্তচর ছিলেন, কারণ এত বছর বাদে হলেও সেটা স্বীকার করেছেন ঐ মামলায় সহদণ্ডিত মর্টন সোবেল এবং সর্বোপরি রোজেনবার্গদের পুত্ররাও। সুতরাং, সোভিয়েটের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির যে অভিযোগে রোজেনবার্গদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল আমেরিকার আদালত ও সরকার, তা যথার্থই ছিল। লেখা হল, ''জুলিয়াস রোজেনবার্গকে সোভিয়েটের চর বলে মেনেই নিচ্ছেন মাইকেল ও রবার্ট মিরোপোল। ...হঠাৎই মুখ খোলেন রোজেনবার্গ মামলায় সহদণ্ডিত মর্টন সোবেল।... গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি চরবৃত্তি করেছিলেন বটে। সোবেলের পর মুখ খুললেন মাইকেল ও রবার্ট মিরোপোল। ...দুই ভাই-ই বলেছেন, মর্টনের বক্তব্যকে সন্দেহ করার কারণ দেখছেন না তাঁরা। অর্থাৎ জুলিয়াসও যে চরবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেটা তাঁরা স্বীকারই করছেন'' (আনন্দবাজার, ১৯-৯-০৮)। আমেরিকায় খবরটা অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসেই প্রচার হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স লিখেছিল, 'ছেলেরা অনুতাপের সঙ্গে স্বীকার করল — বাবা ছিলেন গুপ্তচর'।

বহু বছর পর আজ হঠাৎ এই সংবাদ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন? প্রবীণ মানুষদের কেউ কেউ মনে রাখলেও বর্তমান প্রজন্ম তো এই ঘটনার কিছুই প্রায় জানে না। তবুও এত গুরুত্ব দিয়ে এতদিন পর রোজেনবার্গদের মৃত্যুদণ্ডকে যথার্থ বলে প্রমাণ করার জন্য এই ব্যগ্রতা প্রশ্ন জাগায়। আসলে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবির এখন না থাকলেও মানবসমাজে সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদের লড়াই আজও জারি আছেই। এবং এও অনস্বীকার্য যে, মহান স্ট্যালিন ও তাঁর নেতৃত্বে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কালিমালিপ্ত করার জন্য একটানা প্রচার সত্ত্বেও আজও পুঁজিবাদের বিকল্প সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূর্ত মডেল হিসাবে পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নই মানুষের চিন্তায় বিরাজ করে। সাম্রাজ্যবাদীরা জানে, মানুষের এই ভাবনায় ক্রমাগত আঘাত করে করে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণকে ভেঙে দিতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুত্থান ঠেকানো যাবে না। তাই যেকোনও ঘটনায় তারা সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যেই জুলিয়াস ও এথেল রোজেনবার্গের দুই ছেলের সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিকেও বিকৃত করে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই আক্রমণ করতে চাওয়া হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, সেদিন রোজেনবার্গ দম্পতিকে পরমাণু তথ্য পাচারের যে 'অভিযোগে' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা 'খুন' করেছিল তা সত্য ছিল এবং সেদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন যেন রোজেনবার্গদের প্রকৃতই ভাড়াটে গুপ্তচর হিসাবে ব্যবহার করেছিল। অর্থাৎ রোজেনবার্গদের মৃত্যুর জন্য দায়ী সেদিনের সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সরকার। এই মিথ্যা প্রচারের মুখোশ খুলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব মনে করেই আমরা সেদিনের ঘটনা কিছুটা বিস্তৃতভাবেই তুলে ধরতে চাইছি। আশা করি, এই ঘটনা জানার মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্ম বুঝতে পারবে যে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মুখোশ পরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আদতে জঘন্য ফ্যাসিস্ট ছাড়া কিছু নয়।

আমরা জানি, আমাদের দেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা যদি সিপিএমের মতো মেকি মার্কসবাদীদের কুকর্মের পরিণামে দুর্বল হয়ে না যেত, মার্কসবাদ ও বামপন্থা মসীলিপ্ত না হত, তবে রোজেনবার্গদের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বলার হয়ত প্রয়োজন পড়ত না।

জুলিয়াস রোজেনবার্গ ছিলেন এক পোশাক কারখানার কর্মীর সন্তান। শান্ত, চিন্তাশীল প্রকৃতির যুবক জুলিয়াস হিব্রু ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করার ফলে তাঁর পিতা ভেবেছিলেন সে ইহুদি ধর্মযাজক হবে। কিন্তু স্কুলে পড়ার সময়ই বোঝা যায়, ধর্মে নয়, জুলিয়াসের আগ্রহ রাজনীতিতে। তখনই সে নিউইয়র্ক সিটি কলেজে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের একনিষ্ঠ সদস্য। এই কলেজেই ইথেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯৩৯ সালে উভয়ের বিবাহ হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক জুলিয়াস ১৯৪০ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর সিগনাল বিভাগে চাকরি নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার মিত্র ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন। যুদ্ধ শেষেই শুরু হয় আমেরিকার সোভিয়েট বিরোধী ঠান্ডা যুদ্ধ। সেনেটর জোসেফ ম্যাকার্থির চাতুরিপূর্ণ বাক্যবিন্যাস তখন কাগজের রোজকার হেডলাইন। তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগে কম পক্ষে ২০০ জন কমিউনিস্ট এজেন্ট কাজ করে। শুরু হয়ে যায় সেইসব এজেন্টদের জিজ্ঞাসাবাদ-ধরপাকড়ের অভিযান। প্রচার করা হয়, মার্কিন পরমাণু বোমা প্রকল্পের গোপন তথ্য কমিউনিস্ট এজেন্টরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে পাচার করেছে। এই অভিযোগেই ১৯৫০ সালের ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় জুলিয়াসকে তার ঘর থেকে, দুই শিশুপুত্রের সামনে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। স্ত্রী ইথেলকে গ্রেপ্তার করা হয় ১২ আগস্ট। পুত্র মাইকেলের বয়স তখন ৭, রবার্টের ৩। বাবা-মা জেলে। কিছুদিন পর দিদিমাও ওদের দেখাশোনায় নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। আত্মীয়স্বজন এগিয়ে আসেনি। দুটি শিশু তখন এক আশ্রয় থেকে অন্যত্র ছিটকে পড়েছে। অবশেষে তাদের দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন অ্যাবেল ও অ্যানি মিরাপোল। অ্যাবেল ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক ও গীতিকার।

বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ঝড়

রোজেনবার্গদের যে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে সংবাদমাধ্যমগুলি আজ সাফাই গাইছে, ৫০-এর দশকে সেই মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধেই এই পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষে এবং সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। মিছিল মিটিং বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সমগ্র দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার কোটি কোটি মানুষ। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক-নাট্যকার-শিল্পী, বিশ্ববরেণ্য খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, আইনজ্ঞ — সবাই সেদিন মার্কিন সরকারের 'কাজীর বিচারের' বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আজকের সংবাদমাধ্যমের বেতনভুক কলমজীবীরা কি সেই ইতিহাস জানেন?

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পরমাণুবিজ্ঞানী এবং মার্কিন পরমাণু প্রকল্পের অন্যতম পরিচালক ড. হ্যারল্ড সি উরে সেই সময় 'নিউ

ইথেল ও জুলিয়াস রোজেনবার্গ

ইয়র্ক টাইম্‌স'-এ এক পত্রে লিখেছিলেন, ''রোজেনবার্গ মামলায় দাখিল করা সাক্ষ্য-প্রমাণের তথ্যাদি পড়লাম। এগুলোর ভিত্তিতে যে 'রায়' দেওয়া হয়েছে তাতে সংশয় ধামাচাপা দিতে পারছি না''। তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণের তথ্যগুলি তুলে ধরে ঐ পত্রে তিনি সেগুলির অন্তঃসারশূন্যতা একে একে তুলে ধরেন।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে লেখা বার্তায় বলেছিলেন, ''বিবেকের তাড়নায় বাধ্য হয়ে আপনার কাছে সনির্বন্ধ মিনতি জানাই — জুলিয়াস ও ইথেল রোজেনবার্গের মৃত্যুদণ্ড রদ করুন। ৫-১-১৯৫৩ 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স'-এ আমার বিশিষ্ট সহকর্মী হ্যারল্ড সি উরে যে জোরালো বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তার যুক্তিধারার প্রেরণায় আপনার কাছে এই আবেদন করছি।''

প্যারিসের অ্যাটর্নি পল ভিলার্ড বলেন, ''...রোজেনবার্গ মামলার সব নথিপত্র পড়লাম। নথিপত্রগুলো আমাকে দু'দিনের জন্য ধার দেওয়া হয়েছিল। ... নীতিগতভাবে আমি অন্য দেশের, বিশেষত আমেরিকার মতো বন্ধু রাষ্ট্রের বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে নাক গলানো পছন্দ করি না। কিন্তু এই মামলাটির সরকারি বিবরণ পড়ে আমার পক্ষে ফ্রান্সের রোজেনবার্গ রক্ষা সমিতিতে নাম না লিখিয়ে কিংবা সাহায্য না করে থাকা সম্ভব হল না। ... ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, রোজেনবার্গদের প্রতি যে নিষ্ঠুর দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, তা যেন কার্যে পরিণত করা না হয় এবং অবশেষে তাদের নির্দোষিতা স্বীকৃত হয়।''

প্যারিসের কবি ও লেখক লুই আরাগঁ লেখেন, ''ন্যায়পরায়ণতার এই গর্ভপাতে আমি তীব্র মানসিক আলোড়ন বোধ করছি। ... খেলো প্রহসনের সামিল এই বিচারের বিয়োগান্ত পরিণতি দু'জন নিরপরাধকে বৈদ্যুতিক চেয়ারের দিকে ঠেলে দিয়েছে।...

''স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।... কিন্তু কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণে অভিযোগকে দাঁড় করানো যায়নি।... সারা দুনিয়া প্রতিবাদে মুখর।...''

আমেরিকার ওয়াশিংটন ডি. সি. স্থিত শান্তি ও স্বাধীনতার সপক্ষে **আন্তর্জাতিক নারী সংঘও** প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে যে, ''অপরাধ প্রমাণের ভাসা ভাসা সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা হয়েছে। কুশলী আইনজীবীরা অকাট্য যুক্তি দ্বারা দেখিয়েছেন, গোটা বিচারটাই সাজানো এবং সততার ধার ধারেনি। প্রতি পদক্ষেপে মামলাটি অসঙ্গতিতে ছেয়ে আছে...

''দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, অন্ধ গোঁড়ামি, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদির সাহায্যে অভিযোগকে বিশ্বাসযোগ্য করতে চাওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।...

''...আমাদের ইতিহাসে এমন দণ্ডাদেশের নজির নেই। এই আদেশ রদ করতে হবে, পুনর্বিবেচনা করতে হবে।''

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো ফরাসি ম্যাগাজিনে দণ্ডাদেশের তীব্র বিরোধিতা করে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে লিখলেন, ''সময় চলে যাচ্ছে, এখনই উদ্যোগী হও, মানবতার বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধ ঘটতে দিও না।''

প্রখ্যাত নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক বেরটোল্ট ব্রেখট এবং বিখ্যাত সিনেমা শিল্পী ফ্রিজ লঙ এই পরিকল্পিত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। এমনকী, **পোপ দ্বাদশ পিয়াস** পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড রদের আবেদন জানান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী জাঁ পল সার্ত্রে লিখলেন, ''রোজেনবার্গদের রক্ষা করা প্রয়োজন। কেন না তাঁরা কখনওই নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণে ক্ষান্ত হননি, এবং বিচারকগণ ও যাঁরা তাঁদের অভিযুক্ত করেছেন তাঁরা কখনওই অপরাধ প্রমাণ করতে পারেননি।

''রোজেনবার্গদের স্বার্থে এবং আমাদের স্বার্থেও তাঁদের রক্ষা করা প্রয়োজন। তাঁদের রক্ষা করতে পারলে আমরাও ডাইনি শিকারের হাত থেকে বাঁচতে পারব। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় আমরা স্থির সঙ্কল্প হতে না পারলে মহামান্য সরকার আমাদের মধ্যে থেকে ডজন ডজন রোজেনবার্গের হদিশ পাবে।''

তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে এক পত্রে সার্ত্রে রোজেনবার্গদের মামলাটিকে ''যথাযথভাবে বিচার না করে আইনের নামে মৃত্যুদণ্ডদান'' বলে বর্ণনা করে বলেছেন, ''এই বিচার একটি সমগ্র জাতিকে রক্তে মাখামাখি করে দেয়।'' রাষ্ট্রপতিকে তিনি আরও বলেন, ''এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, রোজেনবার্গদের হত্যার দ্বারা আপনারা মানুষের আত্মত্যাগে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছেন। ডাইনি খোঁজার মতো মানুষকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হত্যা করার এই প্রক্রিয়া দেখে আমরা বুঝতে পারছি, আপনার দেশ ভয়ে কুঁকড়ে আছে। ...নিজেদের বোমার ছায়াকে আপনারা নিজেরাই ভয় পাচ্ছেন।''

পরমাণু বোমার 'গোপন তথ্য' চুরি করে পাচার তো দূরের কথা, রোজেনবার্গরা গুপ্তচরবৃত্তি করেছে তার একটি প্রমাণও মার্কিন সরকার এবং তাদের গোয়েন্দা দফতর আদালতে কিংবা জনসমক্ষে হাজির করতে পারেনি। তবু, আমেরিকা সহ সমগ্র বিশ্বের বিপুল জনগণের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আবেদন-নিবেদন, দুনিয়ার সেরা আইনজ্ঞদের যুক্তি ও পরামর্শ এবং মহান ব্যক্তিত্বদের আবেদন — সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে ১৯৫৩ সালের ১৯ জুন বৈদ্যুতিক চেয়ারে রোজেনবার্গ দম্পতিকে হত্যা করে মার্কিন সরকার। কেন এই পথে মার্কিন শাসকদের যেতে হল, তা বুঝতে হলে প্রথমেই সেই সময়ের দিকে নজর দিতে হবে।

রোজেনবার্গ মামলার প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করেছিল আমেরিকা ও ব্রিটেন। কিন্তু বাস্তবে তারা চেয়েছিল, ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণে সোভিয়েট ধ্বংস হয়ে যাক। তাই পারস্পরিক মৈত্রীচুক্তি সত্ত্বেও সামরিক তথ্যের কোনও প্রকার আদানপ্রদান তারা সোভিয়েটের সঙ্গে করেনি। জার্মানি যখন সোভিয়েটকে পরাস্ত করতে পারছিল না, মরিয়া চেষ্টা সত্ত্বেও সোভিয়েট প্রতিরোধ চূর্ণ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন আমেরিকা ও ব্রিটেন চাইল, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হোক, সোভিয়েট হীনবল হয়ে যাক; তা হলে, হীনবল সোভিয়েটকে শক্তিশালী আমেরিকা ও ব্রিটেন নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য করতে পারবে। তাই, তিন বছর ধরে সোভিয়েট যখন চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ, জার্মানবাহিনী সোভিয়েটের এলাকার পর এলাকা দখল করে নিচ্ছিল, বীভৎস আক্রমণে ও অত্যাচারে সোভিয়েটের লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছিল, তখনও বিপন্ন সোভিয়েটকে সহায়তা দিতে আমেরিকা ও ব্রিটেন এতটুকু এগিয়ে আসেনি। পশ্চিম গোলার্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে আলাদা একটি লড়াইয়ের ফ্রন্ট খোলা এবং তার দ্বারা জার্মান বাহিনীর আক্রমণকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য স্বয়ং স্ট্যালিনের বারংবার আবেদন সত্ত্বেও তারা সাড়া দেয়নি। অবশেষে, স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের নতুন নায়ক মুনতাদার আল জাইদি

আল বাগদাদিয়া টিভির সাংবাদিক মুনতাদার আল জাইদি আজ হয়ে উঠেছেন সারা আরব দুনিয়ার জনগণের নায়ক। সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিশ্বের পয়লা নম্বর সন্ত্রাসবাদী জর্জ বুশকে লক্ষ্য করে তাঁর নিজের পা থেকে জুতো খুলে ছুঁড়ে মারা ও তীব্র ঘৃণায় চিৎকার '...এই নে তোর বিদায় চুম্বন, কুত্তা কোথাকার, ইরাকের সমস্ত বিধবা আর অনাথ শিশুদের পক্ষ থেকে তোর জন্য এটা...'— এই উক্তি লাইভ সম্প্রচারের কল্যাণে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। সাথে সাথেই তিনি হয়ে ওঠেন আরব দুনিয়া তো বটেই, গোটা বিশ্বের সংগ্রামী জনগণের সামনে এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর এই কাজ কতটা শোভন, তা নিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যম চায়ের কাপে যতই তুফান তুলুক না কেন, তা দিয়ে প্রকৃত সত্যটা কোনও ভাবেই চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইরাক তথা সমগ্র আরব দুনিয়ারই মানুষ বাস্তবে তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মার্কিন দখলদারির বুটের তলায় নিষ্পেষিত ইরাকি জনগণের তীব্র ঘৃণারই প্রকাশ। আর তাদের বুকের মধ্যে জমে থাকা সেই তীব্র ঘৃণাই প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ফুটে উঠেছিল সেদিনের ঐ ঘটনায়। সেই কারণেই আজ তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে সারা ইরাক।

বাগদাদ, মসুল সহ ইরাকের প্রায় প্রতিটি বড় শহরে তাই আজ রাস্তায় নেমে এসেছেন হাজার হাজার মানুষ। দাবি একটাই — জাইদিকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। আমেরিকার সেবাদাস ইরাকের পুতুল সরকার জাইদির বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করেছে, তাতে তাঁর ২ থেকে ২৫ বছর জেল নিশ্চিত। জাইদির ভাই অভিযোগ জানিয়েছেন যে, লকআপেই তাঁকে নৃশংসভাবে প্রহার করা হয়েছে। তাঁর হাত ও পাঁজরার হাড় ভেঙে গেছে।

মিশরের কায়রো শহর থেকে প্রচারিত আল বাগদাদিয়া টিভির বাগদাদের সাংবাদিক হিসাবে কাজ করতেন আল জাইদি। মার্কিন দখলদারি-সেনাদের হাতে তাঁকে এর আগে আরও দুবার গ্রেফতার হতে হয়েছিল। ঐ টিভি কর্তৃপক্ষও জোরের সাথে দাবি জানিয়েছে অবিলম্বে জাইদিকে মুক্তি দিতে হবে। তারা বলেছে, মার্কিন শাসকরা তো প্রচার করে, ওরা ইরাকে গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে। তাহলে এখন ওদের নিজেদেরই ঐ সব কথার মর্যাদা রেখে অবিলম্বে জাইদিকে মুক্তি দিক। এর পাশাপাশি লকআপে জাইদির নিরাপত্তা নিয়ে টিভি কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে, জাইদির হয়ে আইনি লড়াই-এর প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। সাদ্দাম হুসেনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আইনজীবী হয়ে যিনি লড়াই করেছিলেন, সেই খলিল আল দুলেইসি নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রায় ২০০ জন আইনজীবীকে নিয়ে একটা টিম তৈরি করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে জাইদির পক্ষে লড়তে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, সওয়ালে তাঁদের বক্তব্য হবে, যেহেতু আমেরিকা আজ ইরাক দখল করেছে, ইরাকের প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার আছে সাধ্যমতো তাকে প্রতিরোধ করার। আর সেই প্রতিরোধের অস্ত্র হিসাবে জুতো তো অতি সাধারণ অস্ত্র মাত্র। তাঁদের কথারই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ইরাকের সংগ্রামীদের কাজে। তাঁরা তাঁদের তীব্র প্রতিরোধ চালিয়েই যাচ্ছেন। যেদিন জাইদি সাংবাদিক সম্মেলনে বুশকে জুতো ছুঁড়ে মারেন, ঐদিনই তারা কঠোরতম নিরাপত্তায় মোড়া বাগদাদের গ্রিন জোনে একটি কাতিউশা রকেট ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায়। ফলে ইরাকি পুতুল সরকারের দুই তথাকথিত পুলিশ কমান্ডো সহ তিনজন মারা যায়। ঐদিনই শহরের দক্ষিণ সীমান্তে ব্যাবেল হোটেলের সামনে একটি গাড়ি বোমার বিস্ফোরণে পুতুল সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রীর কনভয়ের প্রভূত ক্ষতি হয়। মন্ত্রী কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন। তবে প্রতিরোধ শুধু আজ অস্ত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। প্রায়শই তা এখন গণপ্রতিরোধের চেহারাও নিচ্ছে। যেমন, জাইদির ঘটনা থেকেই হয়তো অনুপ্রেরণা লাভ করে দু'দিন বাদে উত্তর ইরাকের রাসাদি শহরের আলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি মার্কিন সেনাগাড়ি ঢুকতে গেলে সংঘবদ্ধভাবে বাধা দেন। জুতো ও পাথরের বৃষ্টির মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত গাড়িটিকে ক্যাম্পাস ছেড়ে পালাতে হয়।

ইরাকের বাইরে বিশ্বের সমস্ত প্রতিবাদী মানুষের কাছেও জাইদি আজ নায়কের মর্যাদাই পাচ্ছেন। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো সাভেজ তো বিস্ময় প্রকাশ করে বলেই ফেলেছেন, 'জুতোটা বুশের গায়ে লাগেনি, সেটা ভালোই। আমি কারুর দিকে লক্ষ্য করেই জুতো ছোঁড়াকে সমর্থন করি না। কিন্তু সত্যি, কী সাহস!' পর্তুগীজ নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপক হোসে সারামাগোও উল্লসিত কণ্ঠে জাইদিকে সমর্থন করেছেন। সাধারণ মানুষের মনের কথা ধরা পড়ছে আর একটি ঘটনায়। বুশকে লক্ষ্য করে জুতো ছোঁড়ার ঘটনাটি অনুকরণ করে পরের দিনই ইন্টারনেটে 'বুশকে লক্ষ্য করে জুতো ছোঁড়ো' বলে একটি গেম চালু হয়ে যায়। দেখা যায় মাত্র একদিনেই বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ৫ লক্ষ ৬৬ হাজারেরও বেশি মানুষ ঐ খেলায় অংশগ্রহণ করে কম্পিউটারের পর্দায় বুশকে লক্ষ্য করে জুতো ছুঁড়ে মারে। সহজেই বোঝা যায়, তাদের বুকের মধ্যে জমে থাকা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঘৃণার পরিমাণটা।

উল্টোদিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অবস্থা কেমন? তাদের মনোভাব ধরা পড়ে, ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ অনুগামী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের একটি সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। বুশের ঠিক পরপরই তিনিও গিয়েছিলেন ইরাকে, দক্ষিণ ইরাকে মোতায়েন ব্রিটিশ সেনাদের ভেঙে পড়া মনোবল একটু চাঙ্গা করার লক্ষ্যে। এই ধরনের সফরে গত কয়েক বছরে একটা নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সফররত মার্কিন বা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক ইরাকে তাঁদের পুতুল সরকারের প্রধান নুর আল মালিকির সাথে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। কিন্তু গর্ডন তা না করে সাংবাদিক সম্মেলনটাকেই বাতিল করে দেন। ভয় পেয়েছেন গর্ডন। নিরাপত্তার বেষ্টনী দিয়ে গুলি আটকানো যায়, কিন্তু জুতোর গোলা কী দিয়ে আটকাবেন?

জাইদির মুক্তির দাবিতে ২০ ডিসেম্বর পাটনায় এ আই ডি এস ও-র মিছিল

কারখানা দখল করে দাবি আদায় করল শিকাগোর শ্রমিকরা

অবশেষে দাবি আদায় করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় রিপাবলিক উইন্ডোজ অ্যান্ড ডোরস কোম্পানির শ্রমিকরা। মালিকের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে ছয় দিন ধরে কারখানা দখল করে রেখেছিল তারা। দীর্ঘ টালবাহানার পর কারখানার মালিক শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং তারপরই কারখানা দখল ছেড়েছে শ্রমিকরা। দাবি ছিল, প্রত্যেক শ্রমিককে ৮ সপ্তাহের মাইনে, ছুটিতে থাকা অবস্থায় বেতন ও দু'মাসের চিকিৎসা খরচ বাবদ ৭ হাজার ডলার দিতে হবে। আন্দোলনের চাপে মালিক এই ন্যায্য দাবিগুলি মেনে নিয়েছে।

মার্কিন আইন অনুযায়ী ছাঁটাই করার ৬০ দিন আগে নোটিস দেওয়ার কথা থাকলেও মাত্র তিন দিনের নোটিসে ২০০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। একদিকে হঠাৎ করে কাজ চলে যাওয়া, অন্যদিকে ছুটিতে থাকা শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ চরমে ওঠে। সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে কারখানার দখল নেয় তারা।

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কারণ হিসাবে চাহিদা কমে যাওয়ার অজুহাত তুলেছিল কারখানা মালিক, পাশাপাশি কাঁচামাল ও কারখানার অন্যান্য জিনিসপত্রও হঠাৎ সরিয়ে ফেলতে শুরু করেছিল। শ্রমিকরা ন্যায্যতই প্রশ্ন তোলে, মালপত্রের অর্ডার মন্দার জন্য আগের থেকে কমেছে ঠিক, কিন্তু মালিক যতটা ব্যাপক কমেছে বলে দেখাচ্ছে, সেটা সত্য নয়। তারা আরও বলে, চাহিদার অভাবটাই যদি কারণ হয়, তাহলে মালিকরা গোপনে উৎপাদিত পণ্য ও কিছু কিছু যন্ত্রপাতি বাইরে পাচার করে দিচ্ছিল কেন? আসলে মালিকদের মতলব ছিল, কারখানা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া, এখানকার শ্রমিকদের পথে বসানো।

শ্রমিকদের এই ন্যায্য আন্দোলনের পিছনে এসে দাঁড়ায় অন্যান্য শ্রমিকরাও। সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন টিমস্টারস, শিকাগো টিচার্স ইউনিয়ন, আমেরিকান ফেডারেশন অব স্টেট-কাউন্টি-মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ সহ আরও অনেকে সংহতি জানায়।

৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে এই শিকাগো শহরেই ১৮৮৬ সালে সংঘটিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক আন্দোলন। বুকের রক্ত ঢেলে দাবি আদায় করেছিল শ্রমিকরা। সেই শিকাগোতেই রিপাবলিক উইন্ডোজ অ্যান্ড ডোরস কারখানার শ্রমিকদের এই আন্দোলন গোটা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে আবার দেখাল যে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়া দাবি আদায় করা যায় না।

স্বরূপনগরে কৃষক বিক্ষোভ, দাবি আদায়

বেলা ২-৩০টা থেকে দুই হাজারের ওপর কৃষকের পথ অবরোধে সন্ধ্যা ৬টায় পুলিশের উপস্থিতিতে বিডিওর সাথে ২০ জন কৃষক প্রতিনিধিদের আলোচনা শেষে বাধ্য হয়ে বিডিও উপস্থিত বিশাল জনতার সামনে মাইকে ঘোষণা করেন, যে সব সারের ডিলার উদ্দেশ্যমূলকভাবে দোকান বন্ধ রেখেছে তাদের তা খোলানো হবে, সরকারি রেটে মেমো সহ সার বিক্রি এবং পাচার বন্ধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এমনটাই ঘটেছে ২২ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর ব্লকে। একই রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো কৃষিপ্রধান এই ব্লকেও রাজ্য সরকারের সার দপ্তর ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে চলছিল সরকার নির্ধারিত দামের চেয়েও বাড়তি চড়া দামে সার বিক্রি, তার উপর যুক্ত হয়েছিল গাড়ির পর গাড়ি সার পাচার। অতিষ্ঠ হচ্ছিলেন কৃষকরা। কোনও কোনও জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিবাদ করে কিছুটা কম দামে সার বিক্রি করানো সম্ভব হলেও ২/৩ দিন বাদে আবার একই পরিস্থিতি ফিরে আসে। ইতিমধ্যে হীন উদ্দেশ্যে সার ব্যবসায়ীরা মাইক প্রচার করে ২০ ডিসেম্বর থেকে দোকান বন্ধ করায় চাষের মরসুমে সার না পেয়ে কৃষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সুসংগঠিত লাগাতার প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে কৃষকদের নিয়ে কৃষিরক্ষা কমিটি গড়ে ওঠে। কৃষকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়ায় ২২ ডিসেম্বর গণবিক্ষোভের দিন ঘোষিত হয়।

আগাম জানানো সত্ত্বেও এডিও'র অনুপস্থিতি সমবেত কৃষকদের ক্ষোভের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ঐ সময় বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে একটা সার বোঝাই ট্রাক ঢুকে পড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। শুরু হয়ে যায় গাড়ি আটক করে অবরোধ। অবরোধ চলাকালীন বক্তব্য রাখেন জয়ন্ত সাহা, আরসাদ গাজী, নিমাই সরকার, বিশ্বনাথ হালদার প্রমুখ। উপস্থিত জনতার দাবি অনুযায়ী বিডিও ডেপুটেশন নিতে আগ্রহ না দেখানোয় ক্ষিপ্ত কৃষকরা অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়। নিরুপায় হয়ে পুলিশের মধ্যস্থতায় বিডিও কৃষক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচায় বসে উত্থাপিত দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। উপস্থিত জনতার সামনে সেকথা মাইকে ঘোষণাও করেন। পরদিন থেকেই সমস্ত বন্ধসারের দোকান খুলে যায় এবং সমবায় দপ্তর থেকে সরকারি রেটে সার বিক্রি শুরু হয়। এই ঘটনা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে আস্থার সঞ্চার করেছে।

রোজেনবার্গ ঃ কোনও অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি

চারের পাতার পর

সোভিয়েটের বিজয়ের পর যখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, সোভিয়েট তার একক শক্তিতেই জার্মানবাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম, এবং বহু জীবনের বিনিময়ে সোভিয়েট যখন তিন বছরের জার্মান অবরোধ চূর্ণ করে জার্মান বাহিনীকে পূর্ব ইউরোপের ওপর দিয়ে জার্মানির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, তখন ১৯৪৪-এর জুন মাসে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী নরমান্ডি অভিযানে নামে, এটা দেখাতে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ে শুধু সোভিয়েট রাশিয়া নয়, তাদেরও ভূমিকা আছে। বিশ্বের জনগণ কিন্তু তখন সোভিয়েট লালফৌজ ও মহান স্ট্যালিনকে ত্রাতার আসনে বসিয়ে বন্দনা করছে, সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বের জনগণের আকর্ষণ ঝড়ের গতিতে বাড়ছে, আমেরিকা তখন নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের থেকেও তারা কত শক্তিশালী অস্ত্রে বলীয়ান বোঝাতে ১৯৪৫-এর আগস্টে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, বিকলাঙ্গ করে। অথচ, জাপবাহিনীকে পরাস্ত করার প্রশ্নে এই ধ্বংসলীলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। এর পরিণতিতে জাপান আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণও করেনি। পরমাণু বোমা নিক্ষেপেরও এক মাস পর ২ সেপ্টেম্বর সোভিয়েট স্থলবাহিনীর ভয়ঙ্কর আক্রমণে জাপ প্রতিরোধ চূর্ণ হয় ও জাপান আত্মসমর্পণ করে।

আসলে, আমেরিকার পরমাণু বোমা ছিল সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক স্পষ্ট হুমকি — আমেরিকা বিশ্বজুড়ে যে সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তারে নামবে, তাতে বাধা দিতে সোভিয়েট যেন সাহস না দেখায়। ইংরেজ অধ্যাপক পি এম এস ব্ল্যাকেট যথার্থই বলেছিলেন, এই বোমা বিস্ফোরণ ''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সামরিক কাজ নয়, এটি হচ্ছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রথম কাজ।''

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই ওই বিশ্বযুদ্ধকে সোভিয়েট বিরোধী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখছিল। 'সহায়-সম্পদ ও সমরাস্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত, রণক্লান্ত' সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আচমকা যুদ্ধের —'অপারেশন আনথিঙ্কেব্‌ল'-এর পরিকল্পনা তৈরির আদেশও জারি করা হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ শুরুর দিনক্ষণও (১ জুলাই, ১৯৪৫) তারা স্থির করে ফেলেছিল বিশ্বযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতিহীন মার্কিনবাহিনী এবং ব্রিটিশ বাহিনী যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বন্দি ১০-১২ ডিভিশন ফ্যাসিস্ট জার্মান সেনাকেও সেই অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা এই পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে যায়। তার প্রধান কারণ, মার্কিন জনগণের মনে সোভিয়েট ও তার লালফৌজ সম্পর্কে তখন একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠছিল এবং তার ফলে সোভিয়েটকে আক্রমণের অপকর্মটি মার্কিন জনগণ কোনও মতে মেনে নিত না; সেই আক্রমণকে মার্কিন শাসকদের ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করত। (সূত্র ঃ 'রিয়া নোভস্তি' পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর গবেষক ডঃ ভ্যালেন্টাইন এম ফালিন-এর ইন্টারভিউ। ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ৪ ও ৫ মে ২০০৫)। মার্কিন জনগণ জানে, ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সমগ্র দুনিয়াকে বাঁচিয়েছে। দারিদ্র, অনাহার, বেকারি, বিনা চিকিৎসায় ভুগতে থাকা সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের কাছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কমরেড স্ট্যালিন তখন মুক্তির অগ্রদূত। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে মার্কিন জনগণই শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। ফলে, আগে আমেরিকান জনগণের মানসিক ধাঁচাটা বদলে দিতে হবে।

শুরু হল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপক রাজনৈতিক, আদর্শগত ও অর্থনৈতিক আক্রমণ। সংবাদপত্রের পাতা, রেডিওর সংবাদ, গল্প, কার্টুন, নাটক এবং সেই সঙ্গে হলিউডের সিনেমা ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ায় বিকৃত তথ্যের সাহায্যে মার্কিন শাসকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ও কমরেড স্ট্যালিনের মহান ভূমিকা ও সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বকে জনমনে খাটো করার জন্য প্রচার চালাল যে, কমিউনিস্টরা কুৎসিত, সোভিয়েট লালফৌজের সেনারা জার্মানবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে যে দেশগুলিতে ঢুকেছে, সেখানেই মেয়েদের উপর বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছে; মানবসভ্যতার পক্ষে তারা বিপজ্জনক; স্ট্যালিন নৃশংস ভয়ঙ্কর ক্ষমতালিপ্সু। প্রচার চলল যে, সোভিয়েট সমাজতন্ত্র একটি অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ ব্যবস্থা; এই দেশটির থেকে আমেরিকানদের শেখবার মতো কিছু নেই।

পাশাপাশি 'ন্যাটো' বাহিনীর সাহায্যে সামরিকভাবে সোভিয়েট রাশিয়াকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হতে লাগল। এই সময়েই ১৯৪৯ সালে মহান নেতা মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনে বিপ্লব সফল হয়। এরপর সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজস্ব পরমাণু বোমার পরীক্ষা সফল করে। সোভিয়েট রাশিয়া এত দ্রুত পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষায় পৌঁছে যাবে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা তা কল্পনাও করতে পারেনি। তারা ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন শাসকরা বুঝে নিল যে, মার্কিন পরমাণু বোমার হুমকির সামনে স্ট্যালিনের সোভিয়েট ইউনিয়ন অসহায় ও প্রতিরোধহীন হয়ে থাকবে না। তারা কোনও সাম্রাজ্যবাদী হুমকির কাছে মাথা নোয়াবে না; দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে সব মুক্তিসংগ্রাম চলছে ও চলবে, পূর্ণ সমর্থন নিয়ে সেগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে সোভিয়েট ইউনিয়ন।

আমেরিকার সরকার জনগণের মধ্যে 'অতীব পশ্চাদ্‌পদ' সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে ছবি নানা মাধ্যমে তুলে ধরছিল, এই ঘটনার পর সেটা প্রবল ধাক্কা খেল। মার্কিন জনমনে প্রশ্ন উঠল, সোভিয়েট কোথায় পশ্চাদ্‌পদ? সোভিয়েট তো দেখিয়ে দিল যে, পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষার ক্ষমতাও তারা রাখে।

এই অবস্থার সামনে পড়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা নতুন প্রচারকৌশল সাজিয়ে বলল, পরমাণু বোমা বানানোর ক্ষমতা 'পশ্চাদপদ' সোভিয়েটের ছিল না; আমেরিকার পরমাণু বোমা সংক্রান্ত গোপন তথ্য তারা চুরি করেছে। প্রমাণ করতে তারা পরমাণু বোমার তথ্য 'পাচারকারীর' অন্বেষণে নামল। এই সঙ্গে মার্কিন প্রশাসন আরও তিনটি মতলব হাসিল করতে চাইল ঃ ১) আমেরিকায় বিপ্লবী কমিউনিস্ট আদর্শের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, সেটা ছত্রখান করে দেওয়া, ২) 'সোভিয়েট ও কমিউনিস্টদের দ্বারা আমেরিকা বিপন্ন' — ধুয়া তুলে মিলিটারি বাজেট তথা যুদ্ধ বাজেট বাড়িয়ে নেওয়া এবং ৩) 'কমিউনিস্ট সন্ত্রাস'-এর অজুহাত দেখিয়ে কোরিয়ার উপর মার্কিন আক্রমণের পক্ষে সওয়াল করা। ফলে, আমেরিকায় যারাই সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী, এমনকী সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতিশীল, তাদেরকেই 'পাচার কর্মে' যুক্ত এবং সে কারণে দেশদ্রোহী ও অশুভশক্তি বলে দাগা মারা হতে লাগল। শুরু হল ধরপাকড়। বলা হল, এরা সবাই মার্কিন জনগণের শত্রু, দেশদ্রোহী; ওদের ক্ষমা নেই। আমেরিকার সাধারণ মানুষের মনে সোভিয়েট ও কমিউনিস্ট বিরোধী বিদ্বেষের বিষ ঢোকানো শুরু হল। হাড় হিম করা সন্ত্রাস ও আতঙ্কের পরিবেশ রচনা করা হল। ১৯৫০ সালে সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিস্টবিদ্বেষী এই প্রচার সর্বোচ্চ স্তরে উঠল। প্রচার চলল যে, সোভিয়েটের হাতে পরমাণু বোমার 'গোপন তথ্য' তুলে দিয়ে দেশদ্রোহীরা আমেরিকার নিরাপত্তাকেই বিপন্ন করে তুলেছে। প্রচার মাধ্যমগুলোতে 'আমেরিকা বিপন্ন' মার্কা প্রচারকে জোরদার করে তোলা হল এবং সেজন্য সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিস্টরাই যে দায়ী তাও সংবাদমাধ্যমগুলিতে একযোগে তারস্বরে প্রচারিত হতে লাগল। প্রচারমাধ্যম, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ এফ বি আই, মার্কিন কংগ্রেস ও আদালত সম্মিলিতভাবে সোভিয়েটবিদ্বেষী এক ভয়াবহ অন্ধ উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল দেশব্যাপী। ফলে, ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার কোনও সুযোগই বাস্তবে রইল না। এটাই ইতিহাসে 'ম্যাকার্থিজম্' নামে পরিচিত। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, শিক্ষক, বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন, লেখক, শিল্পী, নাট্যব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, এমনকী কিছু সরকারি অফিসারের নামেও জরুরি নোটিশ জারি করে মার্কিন সেনেটর জোসেফ ম্যাকার্থির নেতৃত্বাধীন সংসদীয় কমিটির সামনে টেনে আনা হল। অনেকেই বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করল, নয়তো স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে অন্য দেশে পালাতে বাধ্য হল। শ্রমিক আন্দোলন এবং প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত বামপন্থী-গণতান্ত্রিক মানসিকতার সমস্ত মানুষের ওপর নামিয়ে আনা হল রাজনৈতিক নিপীড়ন। অনেকেরই চাকরি চলে গেল, অনেককেই জীবিকা হারাতে হল।

'ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-১৯৫০' নামক কালাকানুন জারি করা হল। মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল বললেন, আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের এবং কমিউনিস্ট ফ্রন্ট সংগঠন বলে চিহ্নিত শতাধিক সংগঠনের সদস্যদের নিজেদের দেশ আমেরিকার প্রতি আনুগত্য নেই, তারা আনুগত্য দেখিয়েছে সোভিয়েতের প্রতি; ওরা দেশদ্রোহী। রাতারাতি আমেরিকার প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষকে 'সোভিয়েটের গুপ্তচর' হিসাবে চিহ্নিত করা হল। বহু জনসেবামূলক সংঘ, যারা নাগরিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে কাজ করত, গঠনমূলক কাজের পক্ষে দাঁড়াত এবং গরিব, সংখ্যালঘু, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মানুষ, বেকার, বয়স্ক ও অক্ষম, গৃহহীন ও অনাহারী মানুষদের সহায়তা দিত, সেই সংঘগুলিকে ধ্বংস করা হল। (১৯৭১ সালে এই আইনটিকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে তৎকালীন মার্কিন সরকার প্রত্যাহার করে নেয়।)

রোজেনবার্গদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা

ঠিক এই পরিবেশে ১৯৫০ সালে গ্রেপ্তার করা হয় জুলিয়াস ও এথেল রোজেনবার্গকে। তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় পরমাণু বোমার 'গোপন তথ্য' চুরি করে সোভিয়েট ইউনিয়নে পাচারের অভিযোগ। সবার মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করে দেওয়া হয় যে, পরমাণু বোমার 'গোপন তথ্য' একমাত্র আমেরিকারই জানা ছিল, সোভিয়েটের জানা ছিল না। রোজেনবার্গরা সেটাই চুরি করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তার জোরেই সোভিয়েট কর্ণধার স্ট্যালিন আমেরিকাকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। আমেরিকা বিপন্ন।

বিচারপতি কাউফম্যানও রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড দানের সপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন, ''আমি মনে করি, আপনাদের অপরাধ খুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর।... রাশিয়ানরা পরমাণু বোমা যে সময় বানাতে পারবে বলে আমাদের সেরা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিল, তার আগেই রাশিয়ানদের হাতে আপনারা পরমাণু বোমা তুলে দেওয়ার ফলেই, আমার মতে, কোরিয়ায় কমিউনিস্ট আগ্রাসন ঘটেছে, যাতে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি আমেরিকানকে জীবন দিতে হয়েছে এবং আরও কত কোটি মানুষকে যে আপনাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মূল্য দিতে হবে কে জানে! ...''

অথচ, বিজ্ঞানীদের বক্তব্যেই প্রমাণিত যে, সমস্তটাই ছিল মিথ্যা ও সাজানো। সোভিয়েট ইউনিয়ন অনেক আগে থেকেই পরমাণু বোমা বানানোর প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং সেটা মার্কিন প্রশাসন ও সরকারের অজানা ছিল না। রোজেনবার্গদের গ্রেপ্তারের আগের বছর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে ওয়াশিংটন ডি সি থেকে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস যে কথা জানিয়ে দিয়েছিল, সেটা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি কমিশন শুক্রবার গুপ্তথ্য-প্রমাণযোগে এ কথা ফাঁস করে দিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র যে বছর ক্ষেপণাস্ত্রটি বের করার কাজে হাত দেয়, সেই ১৯৪০ সাল থেকেই পরমাণু বোমা তৈরির গুপ্তমন্ত্র রাশিয়ার মুঠোয় ছিল।'' সোভিয়েট ইউনিয়ন জানত, আমেরিকা যে পরমাণু বোমা বানাচ্ছে, তা দিয়ে তারা সারা দুনিয়াকে ব্ল্যাকমেল করবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমের দাস বানাবে। শান্তি ও স্বাধীনতার কোনও পরিবেশ দুনিয়ায় তারা রাখবে না। ফলে, দ্রুত পাল্টা পরমাণু বোমা বানিয়ে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে হিটলারের জার্মানির মতোই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও দুনিয়াকে পায়ের তলায় পিষে মারবে। তাই, বাধ্য হয়েই সেই ১৯৪০ সালেই সোভিয়েট ইউনিয়ন পাল্টা পরমাণু বোমা বানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৯ সালে তারা সেই বোমা বানাতে সফল হয়। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে যায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তাদের হীন পরিকল্পনা সোভিয়েট ইউনিয়ন বানচাল করে দেওয়ায়।

রোজেনবার্গদের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী ডেভিড গ্রিনগ্লাস পরমাণু বোমার যে স্কেচটি রোজেনবার্গের মাধ্যমে সোভিয়েটে পাচারের কথা বলেছেন এবং যেটা তিনি হাতে এঁকে আদালতে পেশও করেছেন, সেটি রোজেনবার্গদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে পরমাণু বিজ্ঞানীদের দেখানো হয়নি। সেটা ছিল একটি পরমাণু বোমার নিছকই প্রচ্ছেদ (''a cross-section of the implosion-type atom bomb''), যার সঙ্গে পরমাণু বোমা নির্মাণের বা এই বোমা-নির্মাণ ত্বরান্বিত করার কোনও সম্পর্ক নেই। স্কেচটি দেখার পর বিজ্ঞানীরা সমস্বরে বলেছেন, ডেভিড গ্রিনগ্লাসের আদালতে পেশ করা পরমাণু বোমার স্কেচটি ''অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর, এমনকী ভুল; নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সোভিয়েট পরমাণু বোমা নির্মাণ করে ফেলেছে কি না তা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এই স্কেচটির কোনও কার্যকারিতা বা মূল্যই নেই।''

রোজেনবার্গদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কারণ, যে কোনও মূল্যে এই দণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেই রেখেছিল মার্কিন সরকার ও প্রশাসন। সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি তথা আদালতে সরকার পক্ষের আইনজীবী রয় কোহ্ন পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন, কোন বিশেষ বিচারপতিকে নিয়োগ করলে তাঁকে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ানো যাবে, সে বিষয়ে তিনি প্রভাব খাটিয়েছিলেন এবং রোজেনবার্গদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দিকেই তিনি বিচারককে ঠেলে দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, রোজেনবার্গদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে যে আইনের সাহায্যে, সেটি কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য ছিল। রোজেনবার্গদের বিরুদ্ধে যে সময়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে, সে সময় সোভিয়েতের সঙ্গে আমেরিকার কোনও ঘোষিত যুদ্ধ ছিল না। বরং তখন দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধকালীন মিত্রতা চুক্তি ছিল। যখন দেশ বাস্তবে যুদ্ধের মধ্যে অবস্থান করছে না, তখনই যুদ্ধকালে প্রযোজ্য আইনটি প্রয়োগ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে শত্রুপক্ষকে গোপন তথ্য সরবরাহ করা হয়। সেক্ষেত্রে তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের মিত্রপক্ষ। তাই, এই দণ্ডদান অসাংবিধানিক বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বের বিশিষ্ট আইনজ্ঞরা।

তা ছাড়া, আমেরিকান সিভিল কোর্ট ইতিপূর্বে কখনও

সাতের পাতায় দেখুন

রোজেনবার্গ ঃ বিচারের নামে নির্লজ্জ প্রহসন

ছয়ের পাতার পর

গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে কাউকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়নি। রোজেনবার্গদের মৃত্যুদণ্ডের পরেও বহু আমেরিকান বিভিন্ন দেশের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে; এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আই এবং সি আই এ-র এজেন্ট। এদের কাউকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি।

রোজেনবার্গদের বিরুদ্ধে মামলাটি কেমন করে সাজানো হয়েছিল, তার কিছু নথিপত্র পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০ সালে ব্রিটেনের হারওয়েলে ব্রিটিশ নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টারে পদার্থবিদ্যা বিভাগে কর্মরত বিজ্ঞানী ক্লাউস ফুক্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এফ বি আই নাকি জানতে পারে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার ম্যানহাটান প্রোজেক্টে কাজ করার সময় তিনি ১৯৪৫ সালে পরমাণু বোমা সংক্রান্ত 'গোপন তথ্য' সোভিয়েট ইউনিয়নে পাচার করেছেন। মার্কিন আদালত তাঁকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়। এরপর হ্যারি গোল্ড বলে একজনকে হাজির করা হয়, যিনি স্বীকার করেন যে, তিনি নাকি বিজ্ঞানী ফুক্স-এর বাহক হিসাবে কাজ করেছিলেন। গুপ্তচর চক্রের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি ডেভিড গ্রিনগ্লাস-এর নাম করেন। তখন গ্রিনগ্লাসকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর সবটাই যে সাজানো — তাও পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। ১৪ বছর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করে ফুক্স পরিষ্কার বলেছেন, এটা ডাহা মিথ্যা; গোল্ডকে তিনি চিনতেনেই না। আবার ডেভিড গ্রিনগ্লাসের কাছে যে বার্তাটি নিয়ে গিয়েছিলেন বলে গোল্ড আদালতে কবুল করেছিলেন, সেটাও ছিল গোয়েন্দাবিভাগের শেখানো বুলি। শুধু কি তাই? গোল্ড ও ডেভিড গ্রিনগ্লাস-এর মধ্যে যোগসূত্র দেখানোর জন্য আলবুকার্কের যে দু'টি হোটেল রেজিস্ট্রেশন কার্ড সরকার পক্ষ থেকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল, সেই কার্ড দু'টিও ছিল সম্পূর্ণ জাল।

আদালতে হ্যারি গোল্ড-এর দেওয়া সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে, গোয়েন্দা পুলিশকে দেওয়া প্রথম বয়ানে গোল্ড বলেছিলেন, যে গুপ্তচরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, সেই গুপ্তচরের সাংকেতিক বাক্য নাকি ছিল, 'আমি বেন-এর কাছ থেকে আসছি'। পরে গোল্ড বয়ান পাল্টে নতুন বয়ানে বলেন যে, না, সেই গুপ্তচরের সাংকেতিক বাক্য ছিল, 'আমি জুলিয়াসের কাছ থেকে আসছি'। অর্থাৎ তখন জুলিয়াসকে গুপ্তচরবৃত্তির মামলায় জড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং গোল্ড সেই মোতাবেক নিজের দেওয়া আগের বয়ান বদলেছেন।

আরও দেখা যাচ্ছে, গোল্ড বলেছেন যে, গ্রিনগ্লাস তাঁর হাতে পরমাণু বোমার 'গোপন তথ্য' বিষয়ক লেখা নোট্স ও স্কেচ দিয়েছিলেন। অথচ, গ্রিনগ্লাস বলেছেন, তিনি নোট্স ও স্কেচ দিয়েছেন জুলিয়াস রোজেনবার্গের হাতে এবং সেটা টাইপ করে দিয়েছেন ইথেল রোজেনবার্গ। পরস্পর বিপরীত বক্তব্য, কারও সঙ্গে কারও বয়ান মিলছে না।

এফ বি আই-এর যে সব ডকুমেন্ট প্রকাশ্যে আনা হয় তাতেও দেখা যাচ্ছে, হ্যারি গোল্ড এবং ডেভিড গ্রিনগ্লাস — দু'জন প্রথম দিকে দু'রকম বিবৃতি দিচ্ছেন। ডেভিড বলেছিলেন, তাঁর কাছে গোল্ড নিজেকে 'পিটসবুর্গের ডেভ' বলে পরিচয় দিতেন। আবার গোল্ড বলেছিলেন, তিনি ডেভিডের কাছে নিজেকে 'ব্রুকলিনের বেন' বলে পরিচয় দিতেন। ফলে, দু'জন একই গুপ্তচর চক্রে একসঙ্গে পাচারকার্য করেছেন — এটা প্রমাণ হয় না। তাই, কারাগারে কয়েক মাস রাখার পর দু'জনের বয়ান একসুরে আনার জন্য বিচার শুরুর আগে সরকারি আইনজীবীরা তাঁদের একত্রে হাজির করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এ পর্যন্ত একটিবারের জন্যও এঁদের কেউই জুলিয়াসের নাম উচ্চারণ করেননি। দু'জনকে একত্রে হাজির করার পর সেখানেই হঠাৎ তাঁদের 'জুলিয়াস' নামটি 'স্মরণে আসে'। ডেভিড জানায়, তাঁর বোন ইথেলের স্বামী জুলিয়াস রোজেনবার্গ তাকে 'গোপন তথ্য' সংগ্রহে নিযুক্ত করেছিলেন। পরমাণু বোমা সংক্রান্ত হাতে লেখা তথ্য ও স্কেচ তিনি জুলিয়াসের হাতে দেন। জুলিয়াস সেটা সোভিয়েট গোয়েন্দাদের হাতে দিয়েছেন। গোয়েন্দা ও পুলিশের প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট জানালেন যে, না, তাঁর বোন অর্থাৎ জুলিয়াসের স্ত্রী এই পাচারচক্রে যুক্ত নয়। বরং তাঁর স্ত্রী রুথ এই কাজে বাহক হিসাবে কাজ করেছে। ডেভিডের এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জুলিয়াসকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৫০-এর জুলাই মাসে। কিন্তু জুলিয়াস প্রথম থেকেই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন

ইথেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা প্রধান জে এডগার হুভার মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল হাওয়ার্ড ম্যাকগ্রার কাছে এই যুক্তি দেখান যে, ''যদি জুলিয়াস রোজেনবার্গের মুখ দিয়ে তার দেশদ্রোহিতার বিস্তারিত বিবরণ বের করা যায়, তাহলে অন্যান্য আরও বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান সম্ভব হবে। সে ক্ষেত্রে জুলিয়াসের স্ত্রী ইথেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে সেটা এই ব্যাপারে 'লিভারের' কাজ করবে।'' অর্থাৎ স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে জুলিয়াসকে দিয়ে আরও কিছু ব্যক্তির নাম বলিয়ে নেওয়া যাবে। (সূত্র ঃ দ্য রোজেনবার্গ ফাইল ১৯৮৩, পৃঃ ৯৯ — রোনাল্ড র‍্যাসেস ও জয়সি মিল্টন, নিউ ইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের এমরিটাস প্রোফেসার)। অতএব, ইথেলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হাজির করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেই লক্ষ্যে জুলিয়াসের বিচার শুরুর দশদিন আগে গোয়েন্দা দপ্তর ডেভিডকে প্রস্তাব দেয়, তিনি যদি জুলিয়াসের স্ত্রী ইথেলের বিরুদ্ধে কিছু তথ্য দেন তবে তাঁর স্ত্রী রুথের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হবে না এবং তাঁর শাস্তিও যথাসম্ভব লঘু করার চেষ্টা হবে। এবার ডেভিড তাঁর গল্প বদল করেন। বলা বাহুল্য, আগের বয়ানটিকে বাদ দিয়ে এই বদল করা নতুন বয়ানটিই আদালত গ্রহণ করে। প্রথম বয়ানে ডেভিড বলেছিলেন, নিউ ইয়র্কের একটা রাস্তার কোণে তিনি জুলিয়াসের হাতে পরমাণু বোমা সংক্রান্ত তথ্য তুলে দিয়েছিলেন। এবার তাঁর নতুন বয়ানে তিনি বলেন, রাস্তার কোণে নয়, জুলিয়াসের নিউ ইয়র্কস্থিত ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে সেই তথ্য তাঁর হাতে দেন। এর সঙ্গে রুথ যোগ করেন, হাতে লেখা সেই তথ্য ও স্কেচ বাথরুমের মধ্যে জুলিয়াস নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বেরিয়ে এসে তাঁর স্ত্রী ইথেলকে তক্ষুণি সেটা টাইপ করে দিতে বলেন। ইথেল তাঁর টাইপ রাইটারে ডেভিডের দেওয়া তথ্য টাইপ করে দেন। ডেভিডও স্ত্রী রুথের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন।

এই একটিমাত্র সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই ইথেলকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৫০-এর ১১ আগস্ট। বিচার চলাকালীন সরকার পক্ষের প্রধান আইনজীবী আরভিন সেপল আদালতের জুরিদের বোঝান, ''সোভিয়েট ইউনিয়নে পাচারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা পরমাণু বোমার এই বর্ণনা অভিযুক্ত ইথেল রোজেনবার্গ তাঁর ১০নং মনরো স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্টে বসে বিকেল বেলা টাইপ করে দিয়েছেন। আরও অসংখ্য নানা বিষয়ে তিনি যা করেছেন, তেমনি এবারও তিনি টাইপ রাইটারের 'কি' গুলোতে একটার পর একটা টোকা দিয়েছেন, আর একটার পর একটা আঘাত হেনেছেন তাঁর নিজের দেশের বিরুদ্ধে, সোভিয়েটের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে।'' এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে প্রাণদণ্ডও দেওয়া হয়। অবশ্য, মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর তাদের কথা রেখেছে। গুপ্তচরবৃত্তির মামলায় তারা ডেভিডের স্ত্রী রুথকে এতটুকু জড়ায়নি এবং যে ডেভিড 'গোপন তথ্য' চুরি করে এনেছিল বলে নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁকে তারা প্রাণদণ্ড না দিয়ে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়।

ডেভিড গ্রিনগ্লাস এখনও বেঁচে আছেন। ২০০১-এর ৫ ডিসেম্বর একটি সত্য তিনি স্বীকার করেছেন; নিউ ইয়র্ক টাইম্স-এর সাংবাদিক সাম রবার্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছেন, গুপ্তচরবৃত্তি সংক্রান্ত মামলায় এথেলের জড়িত থাকার যে সাক্ষ্য তিনি ও তাঁর স্ত্রী দিয়েছিলেন, তা ছিল মিথ্যা। এইভাবে মিথ্যা হলফনামা দিতে তাঁকে সরকারি আইনজীবীরা চাপ দিয়েছিল এবং সে এটা করেছিল তার স্ত্রীকে কারাদণ্ডের থেকে বাঁচানোর জন্য। কে গোপন তথ্য টাইপ করেছিল, সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। (সূত্র ঃ দ্য গার্ডিয়ান, ৬-১২-২০০১)

এ সংক্রান্ত বহু তথ্যই জানা যেত, যদি ডেভিডের দেওয়া জবানবন্দী মার্কিন প্রশাসন প্রকাশ করত। কিন্তু, ডেভিডের জীবদ্দশায় সেটা প্রকাশ করা হবে না বলে আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ডেভিডের রফা হয়ে আছে।

(চলবে)

তেল কোম্পানি দেদার মুনাফা লুটছে

একের পাতার পর

ব্যবসায় সরকারি-বেসরকারি কোম্পানিগুলি কত বিপুল পরিমাণে মুনাফা করছে? এই হিসাব মেলালেই দেখা যাবে, সাধারণের ব্যবহার্য পেট্রোপণ্যে সরকার যদি কিছু ভরতুকি দেয়ও, তার থেকে অনেকগুণ বেশি আদায় করে নেয় ট্যাক্স ও মুনাফার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস মালিকদের তো এমনিই কোটি কোটি টাকার ভরতুকি দিচ্ছে। এই মন্দার আবহে জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে মালিকদের তো আরও ভরতুকি দেওয়ার ধুম পড়ে গেছে। যারা এই সেদিন পর্যন্ত জনস্বার্থে ভরতুকি দেওয়ার বিরোধিতা করত, আজ তারা মালিকদেরকে সরকারি ভরতুকি দেওয়ার কথা বলছে এবং সরকার দিচ্ছে। তাহলে কেরোসিনে, গ্যাসে ভরতুকি দিতে হচ্ছে, তাই দাম কমানো যাবে না — এই অজুহাত তোলা কেন?

পেট্রোল-ডিজেল থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে পরিমাণ ট্যাক্স আদায় করে, তা কিছুটা কমালেই জনগণকে স্বস্তি দেওয়া যায়। কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে পেট্রোলে ৫৪-৫৭ শতাংশ এবং ডিজেলে ৩৬ শতাংশ কর আদায় করে।

২০০৬-০৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্য থেকে অন্তঃশুল্ক বাবদ ৫১,৯২২ কোটি টাকা তুলেছে, রাজ্য সরকারগুলি তুলেছে ৫৬,১১৫ কোটি টাকা। ভারত সরকারের পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৭-০৮ সালে এই খাতে ১,৬৪,০০০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। জনগণের ঘাড় ভেঙে এই টাকা আদায় করা হয়েছে। অন্যদিকে দুই সরকারই মালিকদের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে। যে স্পেশাল ইকনমিক জোন গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অনুমোদন দিচ্ছে তার অন্যতম শর্ত হল 'ট্যাক্স হলিডে', অর্থাৎ সমস্ত রকম ট্যাক্স থেকে মালিকরা বাদ। অন্যদিকে যত ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে জনগণের ঘাড়ে। দুই সরকার ট্যাক্স আদায় কমালেই পেট্রল-ডিজেলের দাম আরও কমতে পারে। তারা তা কমাচ্ছে না। এদের মুখে জনস্বার্থের বা জনকল্যাণের কথা আদৌ মানায় কি?

এই সরকার জনগণের সঙ্গে কতটা জালিয়াতি করছে তা বোঝা যায় 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি' নীতির দিকে তাকালেই। দেশের অভ্যন্তরীণ তেল উৎপাদন খরচ বিদেশ থেকে আমদানির খরচের থেকে অনেক কম। স্বাভাবিকভাবেই এই তেল দেশে কম দামে বিক্রি করা যায়। কিন্তু এ দেশের মালিকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় আইনে ব্যবস্থা করা আছে যে, দেশে উৎপাদিত তেলও এ দেশে বিক্রি করা হবে আমদানি করা তেলের দামেই। জনগণের রক্তমোক্ষণ করার কী সুন্দর ব্যবস্থা!

সরকার বলছে তেল কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে। সত্যিই কি তেল কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে? তাই যদি হবে, তা হলে ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি মধ্যপ্রাচ্যে, আরবদেশে, রাশিয়ার সাখালিন দ্বীপে নতুন নতুন তৈলখনি কিনছে কী করে? এটা কি লোকসানের নমুনা? লোকসানের গল্প আরও লাভ করারই কৌশল।

রিলায়েন্স কোম্পানির বাৎসরিক রিপোর্ট বলছে, ২০০৭-০৮ সালে তারা ১৫,৫৪৬ কোটি টাকা লাভ করেছে, সরকারি সংস্থা ও এন জি সি ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের প্রথম ৬ মাসে লাভ করেছে ৫,০৯৭.৪৮ কোটি টাকা যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি। তাহলে লোকসানটা কোথায় হল?লোকসানের তত্ত্ব আমদানি করা হচ্ছে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং আরও দাম বাড়িয়ে মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য।

বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী কিছুদিন আগেই বলেছেন, 'অর্থনীতির নিয়মে তেলের দাম বাড়বেই'। এবার বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমেছে, অর্থনীতির নিয়মে তেলের দাম কমানো হবে না কেন? প্রণব মুখার্জীর এখন মুখে কুলুপ। মুখে কুলুপ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের। কী বলা যাবে এদের চরিত্র নিয়ে? মানুষের প্রতি দরদবোধহীন কিছু ব্যক্তি মন্ত্রীসভা আলোকিত করে বসে থেকে সাধারণ মানুষকে কীভাবে শোষণ করা যায় তার ছলাকলা করছে। এরাই জনগণের দুর্দশাবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা নাকি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত 'জনপ্রতিনিধি'! এরা যদি জনপ্রতিনিধি হয়, তাহলে লুঠেরা মালিকদের প্রতিনিধি কারা?

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা কী? বিজেপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তার সরকারও বার বার নানা অজুহাতে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়েছে। রাজ্যের সিপিএম সরকারও নানা ট্যাক্স বসিয়ে দাম বাড়িয়েছে। এখন দাম কমানো যখন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত তখন সিপিএম ও সহযোগী বামেদের এম পি-রা পার্লামেন্টে মুখ বন্ধ করে বসে আছেন। যারা মালিকশ্রেণীর টাকায় ভোটে জেতে, যারা কেবল ভোট আর গদি দখলের স্বপ্নে মশগুল — সেই সংসদীয় দলগুলি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। অথচ জনজীবনে সংকট বাড়ছে। মানুষ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে এস ইউ সি আই পেট্রোপণ্যের দাম কমানো সহ ১৮ দফা দাবিতে ২২ জানুয়ারি সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বিপর্যস্ত মানুষের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ব্যক্ত হতে চলেছে ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। এবারের ধর্মঘটের দায় সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

নতুন অটো কেনার টাকা সরকারকেই দিতে হবে
এস ইউ সি আই

১৮ জুলাই দেওয়া হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর ১ জানুয়ারি থেকে কলকাতায় টু-স্ট্রোক অটো নিষিদ্ধ করতে চলেছে। এর ফলে শুধু কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেই ২৫ হাজারেরও বেশি অটোচালক চরম সঙ্কটে পড়েছেন।

তীব্র বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত হাজার হাজার বেকার যুবক, ছাঁটাই শ্রমিক সরকারের অনুমোদন নিয়েই অটো চালিয়ে কোনওক্রমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে এঁদের বাঁচানোর দায় রাজ্য সরকার অস্বীকার করতে পারে না। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কীভাবে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আবার অটোচালকদেরও এই বিপর্যয় থেকে বাঁচানো যায়, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগী হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সিপিএম সরকার তা করেনি।

অটোচালকদের বক্তব্য, তাঁরাও দূষণ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। কারণ দূষণের সবচেয়ে বড় শিকার তাঁরাই। কিন্তু টু-স্ট্রোক ইঞ্জিন বাতিলের নামে পুরো গাড়িটাই বাতিলের তাঁরা বিরোধী। অটো ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য, গাড়ি বদল না করেও টু-স্ট্রোক অটোকে ফোর-স্ট্রোক অটোতে রূপান্তরিত করা যায়। অটোচালকদের বিপন্ন না করেই তা করা যায়। কিন্তু রাজ্য সরকার সে বিষয়ে উদ্যোগী না হয়ে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে চালু টু-স্ট্রোক অটো বাতিল করে বাজাজ কোম্পানির ফোর-স্ট্রোক অটো চালু করতে চাইছে। কেন শুধু বাজাজ কোম্পানির অটো? কেন অন্য কোম্পানির নয়? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয়ত, সরকারি 'অটো ফুয়েল পলিসি'তে পরিষ্কার বলা হয়েছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা জ্বালানির সুপারিশ সরকার করছে না। এই অবস্থায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ফোর-স্ট্রোক অটো ব্যবহার করতে হবে, এই নির্দেশে সরকারি অটো ফুয়েল পলিসিই লঙ্ঘিত হয়। অটো চালকদের বক্তব্য, এ কথাটা রাজ্য সরকার কেন পরিষ্কারভাবে আদালতকে জানায়নি? সরকারি অয়েল পলিসিতে আরও বলা হয়েছে, সারা দেশে তরল জ্বালানিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এবং সময়ের সাথে সাথে জ্বালানির মান উন্নত করে দূষণবিধি যাতে মানা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কোথাওই দূষণমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য গাড়ি বাতিলের কথা বলা হয়নি, দূষণমুক্ত জ্বালানি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এজন্যই পরিবহণের জ্বালানি হিসাবে এলপিজি/সিএনজির মতো তরল জ্বালানি এসেছে। ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বহু দিক থেকেই আদালতে ব্যাখ্যা উপস্থিত করা দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, যেটা বিন্দুমাত্র না করে এখন সরকার ভাব দেখাচ্ছে, হাইকোর্টের রায় না মেনে উপায় নেই। সরকার যেন বাধ্য হয়ে অটো বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অটোচালকদের আরও বক্তব্য, বায়ু দূষণের কথা বলে এল পি জি চালিত ফোর-স্ট্রোক বাজাজ অটো চালুর জন্য যত প্রশাসনিক তৎপরতা, অটোর রুটে এল পি জি ভরার পর্যাপ্ত সেন্টার তৈরিতে বা উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সেই তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। যদি পর্যাপ্ত এল পি জি সেন্টার না থাকে, তাহলে অটোগুলি কীভাবে চলবে? এ বিষয়ে সরকার উদাসীন। তাছাড়া, দূষণ সৃষ্টিকারী কাটা তেলের ব্যবসার সঙ্গে সিপিএমের বহু লোক জড়িত। তাই কাটা-তেল নিয়ে সরকার এতদিন কোনও উদ্বেগই দেখায়নি।

অটোচালকরা বরাবরই দাবি করে আসছেন, সরকার তাঁদের সস্তায় জ্বালানি সরবরাহ করুক, তাহলে কাটা তেলের ব্যবহার কমবে। কিন্তু, সরকার এই দাবিতে কর্ণপাত করেনি। বরং নানা ট্যাক্স বসিয়ে জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে। তাছাড়া, সিটু পরিচালিত ইউনিয়ন ও পুলিশের একাংশের দৈনন্দিন তোলাবাজি তো আছেই। এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে না তুলে শুধু টু-স্ট্রোক অটো পাল্টালেই সমস্যার সমাধান হবে না।

২৯ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, নির্দেশ জারি হয়েছে, পুরনো টু-স্ট্রোক অটোগুলি বাজাজ কোম্পানিকে জমা দিতে হবে, বিনিময়ে কোম্পানি দেবে মাত্র ৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ যে অটো কিনতে তাদের লক্ষ টাকার বেশি লেগেছিল, তার মূল্য এখন তারা পাবে মাত্র ৬ হাজার টাকা। এখানেও তাদের বিরাট ক্ষতি। নতুন অটো কেনার জন্য সরকার দেবে ১০ হাজার টাকা। প্রতি অটোর দাম প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। তা হলে বাকি টাকা অটোচালকদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে হবে। এত টাকার ঋণ অটোচালকরা শোধ করবেন কী করে? তাই আমরা বলছি, নতুন অটোর পুরো দামটাই সরকারকে দিতে হবে। এ ভাবেই একমাত্র সমস্যার সমাধান হতে পারে।

মাথা পিছু দেড় লক্ষ টাকা ধরে ২৫ হাজার অটোচালকের জন্য সরকারের খরচ হবে সাড়ে তিনশ কোটি টাকার মতো। সিঙ্গুরে সরকারি ঘোষণা মতো ৬ হাজার চাকরির জন্য সরকার যদি টাটাকে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি অনুদান দিতে পারে, তা হলে ২৫ হাজার অটো চালকের জীবন-জীবিকা রক্ষার জন্য এই টাকা দিতে পারবে না কেন!

অটোচালকদের এই হয়রানির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে অটো বাঁচাও কমিটি। কমিটির নেতৃত্বে ২৮ ডিসেম্বর গড়িয়া-টালিগঞ্জ রুটের ৫ শতাধিক অটোচালক প্রতিবাদ মিছিল করেন। অটো বাঁচাও কমিটির নেতা বিতান হালদার, অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র কলকাতা জেলা সদস্য তপন মুখার্জী এবং এস ইউ সি আই-এর বাঁশদ্রোণী অঞ্চলের সংগঠক সত্যজিৎ চক্রবর্তী মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ২৯ ডিসেম্বর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে প্রায় ২০ হাজার অটোচালক বিক্ষোভ দেখান। বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। তিনি বলেন, টু-স্ট্রোক অটোকে দূষণমুক্ত ফোর-স্ট্রোক অটোতে রূপান্তরিত করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচ সরকারকে বহন করতে হবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, তৃণমূল কংগ্রেসের মদন মিত্র, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বক্তারা সকলেই সরকারের এই আক্রমণ থেকে অটোচালকদের বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

কেরালার এরনাকুলামে ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই কিশোরবাহিনী কমসোমলের রাজ্য ক্যাম্প। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'ছাত্র ও যুব সমাজের কর্তব্য' পুস্তিকাটির উপর ভিত্তি করে ক্যাম্পের আলোচনা পরিচালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমসোমলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড এ রেজিনা। দ্বিতীয় দিন, তরুণ বিপ্লবী কর্মীরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলির সমাধান বিষয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস।

গুজরাটে ছাঁটাই হিরেশ্রমিকদের পাশে এস ইউ সি আই

বিশ্বজোড়া মন্দার অজুহাতে সুরাট সহ গুজরাটের অন্যান্য এলাকার হিরে কাটা ও পালিশ করার কারখানাগুলি একের পর এক বন্ধ করে দিচ্ছে মালিকরা। গত দেওয়ালি থেকে হিরে কারখানাগুলিতে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়েছে। গোটা রাজ্যে এ পর্যন্ত কাজ হারিয়েছে ৮ লক্ষ হিরেশ্রমিক। গুজরাটের 'হিরে-শহর' হিসাবে পরিচিত সুরাটেই কাজ চলে গেছে ৪ লক্ষ শ্রমিকের। এর জেরে সুরাটে প্রতিদিন গড়ে একজন হিরেশ্রমিক বা তার পরিবারের কোনও সদস্যের আত্মহত্যা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত সপ্তাহে আটজন আত্মঘাতী হয়েছে।

সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের প্রবল খরা এবং অপর্যাপ্ত জলসেচ ব্যবস্থার কারণে বহু কৃষকই আজ হিরেশ্রমিকের কাজ করে। মূলত সুরাটের হিরে কাটা ও পালিশ কারখানাগুলিতে কাজ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। হঠাৎ কাজ চলে যাওয়ায় এই মানুষগুলির জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। পেটের ভাত জোগাড় করতে গিয়ে ঋণের ফাঁদে পড়ছে তারা। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে কাজ করতে পাঠাতে হচ্ছে। ফলে বেড়ে গিয়েছে এলাকার শিশুশ্রমিকের সংখ্যা।

কিন্তু হিরেশ্রমিকদের এই চূড়ান্ত দুর্দশায় গুজরাটের বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের কোনও হেলদোল নেই। রাজ্যের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সৌরভ প্যাটেল মন্তব্য করেছেন, ৪০ লক্ষ মানুষের এই শহরে গুটিকয়েক মানুষের আত্মহত্যা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়, এ নিয়ে এত হৈ চৈ করার কী আছে!

জনসাধারণের দুর্দশার প্রতি নির্মম ভাবে উদাসীন গুজরাটের নরেন্দ্র মোদি সরকার হিরেশ্রমিকদের বাঁচানোর ন্যূনতম চেষ্টা না করলেও সুরাটে তিনদিনের একটি মণিরত্ন ও গহনার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলনের আয়োজন করে তারা। এ জন্য হিরে কারখানাগুলিকে আলোর মালায় সাজাবার হুকুম দেয় মোদি সরকার এবং হুমকি দেয়, নির্দেশ না মানলে ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটবে।

গুজরাটের হিরেশিল্প থেকে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তারা সুরাটের হিরেশ্রমিকদের এই দুর্দশা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমাগত চড়তে থাকলেও হিরেশ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি। এখন ছাঁটাইয়ের কবলে পড়ে তাদের দুর্দশা আরও চরমে পৌঁছেছে।

গুজরাটের হিরেশ্রমিকরা গত জুলাই মাসে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এই আন্দোলনে একজন শ্রমিক শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। এরপর মজুরি বাড়ানোর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদের আবার কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হয় এবং দেওয়ালি উপলক্ষে গহনার বাড়তি চাহিদা মেটাতে তাদের দিয়ে 'ওভারটাইম' কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। তার পরেই নেমে এসেছে ছাঁটাইয়ের এই খাঁড়া।

গত জুলাই থেকেই হিরেশ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই। গুজরাটের হিরেশ্রমিক এবং সংকটগ্রস্ত অন্যান্য শ্রমিকদের নিয়ে একটি সংহতি সম্মেলনের আয়োজন করা ছাড়াও এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বহু সভা-সমিতি, বিক্ষোভ মিছিল ও স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচি পালিত হয়েছে। অবিলম্বে হিরে কারখানাগুলি খোলা, কারখানা বন্ধ থাকাকালীন শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি দেওয়া এবং সমস্ত শ্রম আইন মেনে চলার দাবিতে ২৪ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সুরাটে জেলাশাসক এবং শ্রম কমিশনারের দপ্তরে কয়েক হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র পেশ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সুরাট জেলা সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড রামভরত মৌর্য, এ আই ডি ওয়াই ও-র সুরাট শাখা সম্পাদক কমরেড সত্যেন্দ্র সিং, কমরেডস রামমূরত মৌর্য, নওল ঝা প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in